হাসি ও কান্না
Islamicalo.com

হাসি ও কান্না

আব্দুল হামীদ মাদানী

সূচীপত্র

ভূমিকা

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

অনাবৃষ্টি দেখা দিলে যেমন অনেক ভাই উলামার নিকট পানি প্রার্থনার দুআর আবেদন জানান, তেমনি অনেক ভাই আমার কাছে এই অভিযোগ জানান যে, ভোগ-বিলাসের মায়ায় মানুষের হৃদয় যেন কঠোর হয়ে গেছে। সুতরাং এমন কিছু বলুন বা লিখুন, যাতে মানুষ আল্লাহর ভয়ে কাঁদতে উদ্বুদ্ধ হয়।

প্রথমতঃ এ ব্যাপারে একাধিক জালসায় বক্তৃতা করি। তারপর লিখতে উদ্বুদ্ধ হই। যদি কোন শক্ত মনের মানুষের মন নরম হয়, যদি কেউ আল্লাহর ভয়ে কাঁদতে অভ্যাসী হয়ে যায়---সেই আশার বাসা বুকে বেঁধে লিখে শেষ করলাম।

মানুষের হৃদয় মহান আল্লাহর দুই আঙ্গুলের মাঝে। তিনি চাইলে মনের পরিবর্তন ঘটাতে পারেন। তিনি মৃত ভূমিকে বৃষ্টি দিয়ে সঞ্জীবিত করেন। তিনি চাইলে মৃত হৃদয়কেও নম্রতা ও করুণার বৃষ্টি দিয়ে উজ্জীবিত করবেন। তিনিই তওফীকদাতা।

যদি মন ভেজে, যদি চোখ কাঁদে,
পথের পাথেয় সাথে যদি কেউ বাঁধে---
তবেই হইবে সফল মোর এই লেখা,
পাঠক-হৃদয়ে যদি আঁকে মায়া রেখা।

আমার নিজের জন্য, পাঠকের জন্য এবং সকল মুসলিমদের জন্য এর তওফীক চাই।

বিনীত---
আব্দুল হামীদ মাদানী
আল-মাজমাআহ, সঊদী আরব
১৩/২/৩২হিঃ
১৭/ ১/২০১১

হাসি

মনের যে আনন্দ ও তৃপ্তি ওষ্ঠাধরে প্রকাশ পায়, তাকে আমরা ‘হাসি’ বলি। হাসি মানুষের প্রকৃতিগত একটি স্বভাব। খুশীর সময় হাসি আসে। অনেকের হাসা দেখে হাসি আসে। ‘বুড়ায় বুড়ায় কথা হয় কথায় কথায় কাশি, যুবায় যুবায় কথা হয় কথায় কথায় হাসি।’

অনেকে কথায় কথায় ফিক্‌ফিক্‌ বা ফ্যাক্‌ফ্যাক্‌ ক’রে হাসে। হাসির কথা না হলেও হাসে। অনেকে সব সময় হাসে না, তবে হাসির কথায় ‘হাঃ-হাঃ’ ক’রে অট্টহাসি হাসে। কিন্তু সবচেয়ে সুন্দর হাসি, মুচকি হাসি।

অবশ্য এর বিপরীত কিছু মানুষ আছে, যারা হাসতেই জানে না। তারা এমন গম্ভীর যে, হাসির সময়েও তাদের কপালে ভাঁজ পড়ে থাকে, ভ্রূ কুঞ্চিত থাকে, মুখকে ক’রে থাকে বাংলা পাঁচের মত।

কোন কোন হাসি আছে অবাক ও আশ্চর্য হওয়ার হাসি। যেমন ইব্রাহীম عليه السلام-এর স্ত্রীর হাসি, তিনি প্রায় সত্তর বছর বয়সে সন্তানের সুসংবাদ পেয়ে হেসেছিলেন। মহান আল্লাহ বলেন,

[وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ (٧١) قَالَتْ يَا وَيْلَتَا أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخاً إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ (٧٢) قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللهِ رَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ] (٧٣)

سورة هود

অর্থাৎ, সে সময় তার স্ত্রী দন্ডায়মান ছিল, সে হেসে উঠল। তখন আমি তাকে (ইব্রাহীমের স্ত্রীকে) সুসংবাদ দিলাম ইসহাকের এবং ইসহাকের পর ইয়াকূবের। সে বলল, ‘হায় ভাগ্য! আমি কি সন্তান প্রসব করব অথচ আমি বৃদ্ধা এবং আমার এই স্বামীও বৃদ্ধ! বাস্তবিকই এটা তো একটা বিস্ময়কর ব্যাপার!’ *(হূদঃ ৭১-৭২)*

অনেক হাসি হাসা হয় অপরকে বিদ্রূপ করার জন্য। কোন বিষয়কে কেন্দ্র ক'রে ব্যঙ্গ-হাসি হাসে অনেকে। যেমন কাফেররা মহান আল্লাহর আয়াত ও নিদর্শন নিয়ে হাসি-তামাশা করেছিল। মহান আল্লাহ বলেন,

[فَلَمَّا جَاءهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ] (٤٧) سورة الزخرف

অর্থাৎ, সে ওদের নিকট আমার নিদর্শনাবলীসহ আসা মাত্র ওরা তা নিয়ে হাসিঠাট্টা করতে লাগল। *(যুখরুফ ঃ ৪৭)*

আর তার ফলেই মহান আল্লাহ তাদেরকে শায়েস্তা করেছিলেন। তিনি বলেন,

[وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ] (٤٨) سورة الزخرف

অর্থাৎ, আমি ওদেরকে যে নিদর্শন দেখিয়েছি, তার প্রত্যেকটি ছিল ওর পূর্ববর্তী নিদর্শন অপেক্ষা বৃহত্তর। আমি ওদেরকে শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করেছিলাম; যাতে ওরা সৎপথে প্রত্যাবর্তন করে। *(ঐ ঃ ৪৮)*

এক শ্রেণীর মানুষ ঈমানদার মানুষদেরকে নিয়ে হাসাহাসি করে। কেউ দাড়ি দেখে হাসে, কেউ বোরকা দেখে হাসে, কেউ হাসে আরও অন্য দ্বীনদারী দেখে। কাফেররা মুসলিমদেরকে দেখে হাসাহাসি করে। সে হাসির কথা মহান আল্লাহ বলেছেন,

[إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ (٢٩) وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ (٣٠) وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمُ انقَلَبُوا فَكِهِينَ (٣١) وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ (٣٢) وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ] (٣٣) المطففين

অর্থাৎ, নিশ্চয় যারা অপরাধী তারা মু'মিনদেরকে নিয়ে হাসাহাসি করত এবং তারা যখন মুমিনদের নিকট দিয়ে যেত, তখন চোখ টিপে ইশারা করত এবং যখন তারা আপনজনের নিকট ফিরে আসত, তখন তারা ফিরত উৎফুল্ল হয়ে এবং যখন তাদেরকে দেখত, তখন বলত, 'এরাই

তো পথভ্রষ্ট।' অথচ তাদেরকে তো এদের সংরক্ষকরূপে পাঠানো হয়নি! *(মুত্বফফিফীন ঃ ২৯-৩৩)*

ফলে হাসি দিয়েই তাদের প্রতিশোধ নেওয়া হবে। আর যে শেষে হাসে, সেই সফল হয়। মহান আল্লাহ কিয়ামতে সেই বদলা গ্রহণের কথা বলেছেন,

[فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ (٣٤) عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ (٣٥) هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ] (٣٦) سورة المطففين

অর্থাৎ, আজ তাই মুমিনগণ হাসাহাসি করবে কাফেরদেরকে নিয়ে। সুসজ্জিত আসনে বসে তারা দেখতে থাকবে। কাফেররা যা করত, তার ফল তারা পেল তো? *(ঐ ঃ ৩৪-৩৬)*

জাহান্নামে দিয়ে তাদের প্রতিশোধ নেওয়া হবে। তখন তারা বলবে,

[رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ] (١٠٧) المؤمنون

অর্থাৎ, হে আমাদের প্রতিপালক! এই আগুন হতে আমাদেরকে উদ্ধার কর; অতঃপর আমরা যদি পুনরায় অবিশ্বাস করি, তাহলে অবশ্যই আমরা সীমালংঘনকারী হব।' *(মু'মিনূন ঃ ১০৭)*

আল্লাহ বলবেন,

[اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ (١٠٨) إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ (١٠٩) فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ (١١٠) إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ] (١١١) المؤمنون

অর্থাৎ, তোমরা হীন অবস্থায় এখানেই থাক এবং আমার সাথে কোন কথা বলো না। আমার বান্দাদের মধ্যে একদল ছিল যারা বলত, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা বিশ্বাস করেছি; সুতরাং তুমি আমাদেরকে ক্ষমা ক'রে দাও ও আমাদের উপর দয়া কর, তুমি তো দয়ালুদের মধ্যে

শ্রেষ্ঠ দয়ালু।' কিন্তু তাদেরকে নিয়ে তোমরা এতো ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে যে, তা তোমাদেরকে আমার কথা ভুলিয়ে দিয়েছিল; তোমরা তো তাদেরকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টাই করতে। আমি আজ তাদেরকে তাদের ধৈর্যের কারণে এমনভাবে পুরস্কৃত করলাম যে, তারাই হল সফলকাম।' *(ঐ ঃ ১০৮-১১১)*

কিছু হাসি আছে অহংকারের, গর্বের, অপরকে তুচ্ছজ্ঞান ক'রে মানসিক তৃপ্তির হাসি। এমন হাসি অবশ্যই বৈধ নয়।

বৈধ নয় হিংসার হাসি হাসা। 'হিংসে হাসি চিমসে বাঁকা, কাল কুট্কুট্ গরল মাখা।'

কিছু হাসি হয় সন্তুষ্টির, মৌন-সম্মতির। কাউকে নিজের মনোমতো কাজ করতে দেখে খুশী হয়ে এমন হাসি হাসা হয়। বিয়ের ব্যাপারে মতামত জানতে গেলে অনেক লজ্জাশীল তরুণ-তরুণী এই শ্রেণীর (মুচকি) হাসি হেসে সম্মতি জানায়।

মা আয়েশা যখন ছোট ছিলেন, তখন কাপড়ের তৈরি পুতুল নিয়ে খেলা করতেন। তার মধ্যে একটি ঘোড়া ছিল, যার দু'টি ডানা ছিল। নবী ﷺ তা দেখে বললেন, 'এটা কী?' আয়েশা বললেন, 'ঘোড়া।'

তিনি বললেন, 'ঘোড়ার আবার দু'টি ডানা?' আয়েশা বললেন, 'আপনি কি শুনেনি, সুলাইমান (নবী)র ডানা-ওয়ালা ঘোড়া ছিল?'

এ কথা শুনে নবী ﷺ হাসলেন এবং সে হাসিতে তাঁর চোয়ালের দাঁত দেখা গেল। *(আবু দাউদ, মিশকাত ২/২৪১)*

আম্র বিন আস ؓ বলেন, যাতুস সালাসিল যুদ্ধ সফরে এক শীতের রাতে আমার স্বপ্নদোষ হল। আমার ভয় হল যে, যদি গোসল করি, তাহলে আমি ধ্বংস হয়ে যাব। তাই আমি তায়াম্মুম করে সঙ্গীদেরকে নিয়ে (ইমাম হয়ে) ফজরের নামায পড়লাম। আমার সঙ্গীরা এ কথা নবী ﷺ-এর নিকটে উল্লেখ করলে তিনি বললেন, "হে আম্র! তুমি নাপাক অবস্থায় তোমার সঙ্গীদের ইমামতি করেছ?"

আমি গোসল না করার কারণ তাঁকে বললাম। আরো বললাম যে,

আল্লাহ তাআলার এ বাণীও আমি শুনেছি, তিনি বলেন,

[وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً] ﴿النساء:٢٩﴾

"তোমরা আত্মহত্যা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি বড় দয়াশীল।" *(নিসা ঃ ২৯)* এ কথা শুনে নবী ﷺ হাসলেন।

রাগের সময় মুচকি হাসি হয়। কা'ব বিন মালেক ؓ তবূকের যুদ্ধে ইচ্ছাকৃত অংশগ্রহণ করেননি। আরও অনেকে করেনি। তারা সকলে এসে মিথ্যা ওজর পেশ করতে লাগল। তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের বাহ্যিক ওজর গ্রহণ ক'রে নিলেন, তাদের বায়আত নিলেন, তাদের জন্য (আল্লাহর কাছে) ক্ষমা প্রার্থনা করলেন এবং তাদের গোপনীয় অবস্থা আল্লাহকে সঁপে দিলেন। অবশেষে আমিও তাঁর খিদমতে হাজির হলাম। অতঃপর যখন আমি তাঁকে সালাম দিলাম, তখন তিনি রাগান্বিত ব্যক্তির হাসির মত মুচকি হাসলেন।' *(বুখারী-মুসলিম)*

নবী ﷺ-এর হাসি

নবী ﷺ-এর হাসি-কান্না বরং সকল কর্মই ছিল মাঝামাঝি। যেহেতু তাঁর উম্মতের বৈশিষ্ট্যই হল মধ্যপন্থা। মহান আল্লাহ বলেছেন,

[وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً] ﴿البقرة:١٤٣﴾.

অর্থাৎ,এভাবে আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি। *(বাক্বারাহ ঃ ১৪৩)*

সুতরাং তিনি কাঁদতেন, কিন্তু উচ্চরবে কাঁদতেন না; যদিও কখনও কখনও তাঁর কান্নার আওয়াজ শোনা যেত।

তিনি হাসতেন, কিন্তু অট্টহাসি হাসতেন না। তিনি অধিকাংশ সময় মুচকি হাসি হাসতেন। সশব্দে খুব কমই হাসতেন।

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'নবী ﷺ-কে কখনো এমন উচ্চ হাস্য হাসতে দেখিনি, যাতে তাঁর আলজিভ দেখতে পাওয়া যেত। আসলে

তিনি মুচকি হাসতেন।' *(বুখারী-মুসলিম)*

জারীর বিন আব্দুল্লাহ ﷺ বলেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ যখনই আমাকে দেখতেন, তখনই মুচকি হাসতেন।' *(বুখারী-মুসলিম)*

বাংলায় একটা কথা প্রচলিত আছে, 'যত হাসি তত কান্না, বলে গেছে কবি মান্না।' কথাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি না হলেও গর্বযুক্ত হাসি অবশ্যই ভাল নয়। যে আনন্দের মাঝে গর্ব থাকে, অহংকার ও আত্মশ্লাঘা থাকে, সে আনন্দের হাসি অবশ্যই সুখের নয়।

কারূন অনুরূপ আনন্দিত ছিল। তাকে তার গোত্রের লোক নিষেধ করেছিল, কিন্তু সে কর্ণপাত করেনি। ফলে তাকে ইলাহী গযবের শিকার হতে হয়েছিল। মহান আল্লাহ সে কথা বলেছেন,

[إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ] (٧٦) سورة القصص

অর্থাৎ, কারূন ছিল মূসার সম্প্রদায়ভুক্ত, কিন্তু সে তাদের প্রতি যুলুম করেছিল। আমি তাকে ধনভান্ডার দান করেছিলাম, যার চাবিগুলি বহন করা একদল বলবান লোকের পক্ষেও কষ্টসাধ্য ছিল। স্মরণ কর, তার সম্প্রদায় তাকে বলেছিল, 'দম্ভ করো না, আল্লাহ দাম্ভিকদেরকে পছন্দ করেন না। *(ক্বাস্বাসঃ ৭৬)*

বেশি হাসা ভাল নয়। বেশি হাসলে হৃদয় কঠোর হয়ে যায়। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমরা বেশী বেশী হেসো না। কারণ, বেশী হাসার ফলে হৃদয় মারা যায়।" *(আহমাদ, ইবনে মাজাহ ৪১৯৩, সহীহুল জামে' ৭৪৩৫নং)*

পক্ষান্তরে সবচেয়ে মারাত্মক হাসি হল বিরোধী বা শত্রুপক্ষের বিপদ দেখে মিষ্টি হাসা। যেমন গৃহদ্বন্দ্ব বাধলে বাইরে থেকে শত্রু হাসে। ছোট ভাই হারূন নবী বড় ভাই মূসা নবীকে এমন হাসি না হাসাতে অনুরোধ করেছিলেন। মহান আল্লাহ বলেন,

[وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِيَ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْتُلُونَنِي فَلاَ تُشْمِتْ بِيَ الأعْدَاء وَلاَ تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ] (١٥٠) سورة الأعراف

অর্থাৎ, আর মূসা যখন ক্রুদ্ধ ও দুঃখিত অবস্থায় স্বীয় সম্প্রদায়ের নিকট প্রত্যাবর্তন করল, তখন বলল, 'আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা কিই না জঘন্য কাজ করেছ! তোমাদের প্রতিপালকের আদেশের পূর্বেই কেন তোমরা তাড়াহুড়া করতে গেলে?' সে ফলকগুলি ফেলে দিল এবং তার ভাইকে মাথায় ধরে নিজের দিকে টেনে আনল। হারূন বলল, 'হে আমার মায়ের পুত্র (সহোদর)! লোকেরা তো আমাকে দুর্বল মনে করেছিল এবং আমাকে মেরে ফেলতে উদ্যত হয়েছিল। সুতরাং তুমি আমাকে নিয়ে শত্রু হাসায়ো না এবং আমাকে অনাচারীদের দলভুক্ত গণ্য করো না। *(আ'রাফঃ ১৫০)*

দুশমন-হাসির চাবুক গায়ে বড্ড লাগে। তাই আমাদের নবী ﷺ এই হাসি থেকে আল্লাহর নিকট নিম্নের দুআ বলে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلاَءِ وَدَرَكِ الشَّقَاءِ وَسُوْءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ.

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! অবশ্যই আমি তোমার নিকট কঠিন দুরবস্থা (অল্প ধনে জনের আধিক্য), দুর্ভাগ্যের নাগাল, মন্দ ভাগ্য এবং দুশমন-হাসি থেকে রক্ষা কামনা করছি। *(বুখারী, মুসলিম ২৭০৭নং)*

অবশ্যই 'মিষ্টি হাসে সৃষ্টি নাশ।' মধুর হাসি দিয়ে মানুষের মন জয় করা যায়। মানুষের মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সুদৃঢ় হয়। আর সে জন্যই মানুষের সাথে সাক্ষাৎ কালে মিষ্টি হাসির ফুল উপহার দিয়ে অভ্যর্থনা জানাতে হয়। আর তাতে সদকাহ করার মতো সওয়াব লাভ হয়।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "প্রত্যেক কল্যাণমূলক কর্মই হল সদকাহ (করার সমতুল্য)। আর তোমার ভায়ের সাথে তোমার হাসিমুখে সাক্ষাৎ

করা এবং তোমার বালতির সাহায্যে (কুয়ো থেকে পানি তুলে) তোমার ভায়ের পাত্র (কলসী ইত্যাদি) ভরে দেওয়াও কল্যাণমূলক (সৎ)কর্মের পর্যায়ভুক্ত।" *(আহমাদ, তিরমিযী, হাকেম)*

তিনি আরও বলেন, "কল্যাণমূলক কোন কর্মকেই অবজ্ঞা করো না, যদিও তা তোমার ভায়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করেও হয়।" *(মুসলিম ২৬২৬ নং)*

অবশ্য যাদের আপোসে দেখা-সাক্ষাৎ অবৈধ, তাদের মাঝে এমন হাসিতে সওয়াবের জায়গায় গোনাহ আছে।

কান্না

কান্না মানুষের একটি প্রকৃতিগত স্বভাব। দুঃখ-কষ্ট পেলে প্রত্যেক মানুষের কান্না আসে। মহান স্রষ্টা মানুষের প্রকৃতিতে এমনই কার্যকারণ সৃষ্টি ক'রে রেখেছেন, যার ফলে মানুষ হাসে ও কাঁদে। তিনি বলেছেন,

[وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى (٤٢) وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى (٤٣) وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا]

(٤٤) سورة النجم

অর্থাৎ, আর এই যে, সবকিছুর সমাপ্তি তো তোমার প্রতিপালকের নিকট। আর এই যে, তিনিই হাসান, তিনিই কাঁদান এবং এই যে, তিনিই মারেন, তিনিই বাঁচান। *(নাজমঃ ৪২-৪৪)*

আত্বা বিন আবী মুসলিম বলেন, 'অর্থাৎ তিনি মানুষকে আনন্দ দান করেন ও দুঃখগ্রস্ত করেন। যেহেতু আনন্দ হাস্য আনয়ন করে এবং দুঃখ আনয়ন করে ক্রন্দন।' *(তফসীর কুরতুবী)*

'আলোক ও ছায়া হাসি ও অশ্রু বিধাতার দুটি দিক,
কাঙাল কখনো রাজ্য লভিছে রাজায় মাগিছে ভিক।'

বিজ্ঞানীরা বলেছেন, 'হাসি-কান্না দু'টো এক অনুভূতির ভিন্ন প্রকাশ। একটি বায়বীয়, অন্যটি জলীয়।'

আর প্রত্যেক মানুষের জীবনে জড়িয়ে আছে এই আজব অনুভূতি ও

তার আবহমান বহিঃপ্রকাশ। জীবন মানেই হাসি-কান্না। আবর্তনশীল জীবনে কখনও আসে হাসি, কখনও কান্না। এটাই মানুষের প্রকৃতি।

কিন্তু হাসির সময় মানুষের নিয়ন্ত্রণহারা হওয়া চলে না। যেমন কান্নার সময় তার নিরাশ হওয়া উচিত নয়।

অবশ্য হাসি-কান্নার অনুভূতির উৎস হল দু'টি; ইহলৌকিক ও পারলৌকিক।

ইহলৌকিক কারণে হাসলে সে হাসিতে দুনিয়া শরীক হবে। আর কাঁদলে একাই কাঁদতে হবে। পক্ষান্তরে পারলৌকিক কারণে হাসলে সে হাসিতে সবাই শরীক হতে চাইবে না। আর কাঁদলে একাকীই বেশি তৃপ্তি পাওয়া যাবে।

ইহলৌকিক হাসির কারণ বহুমুখী। মানুষ শতভাবে হাসতে জানে। বিজয়ী বেশে দুঃখকে জয় ক'রে জীবন নিয়ে 'ইনজয়' করে। তবে অধিকাংশ মানুষ ইহলৌকিক কান্নার স্রোতে ভাসমান। তাদের জীবন যেন একটি পিঁয়াজের মত। একটির পর একটি খোসা কেবল। আর তাতে শুধু অশ্রুধারা।

কেউ প্রকাশ্যে কাঁদে, কেউ গোপনে। কেউ বেদনা লুকিয়ে রেখে লোকালয়ে হাসে, কিন্তু নিরালায় কাঁদে।

জন্মের পর থেকেই মানুষ কাঁদতে শেখে। হাসতে শেখে দেরিতে। আর কান্না শিখাবার জিনিসও নয়। তাইতো কান্না শিখাতে গেলে, কাঁদতে উদ্বুদ্ধ করতে গেলে অনেকে বলে, 'আপনি কান্না শিখাতে চান? আরে! এটা তো আমরা জানি। আপনি বরং হাসতে শিখান। কীভাবে হাসতে পারব, তাই বলুন।' ওরা বলে,

'শিখায়েছে ওরা কেমনে আমরা কাঁদিব জীবন ভরে,
কত ভাল হতো যদি শিখায়িত হাসিব কেমন ক'রে!'

অনেকে বলে, 'কান্না তো মহিলাদের প্রকৃতি। পুরুষদের জন্য তা শোভনীয় নয়।'

অনেকে ধারণা করে, এ নারীসুলভ স্বভাব কাপুরুষদের।

কিন্তু নারীরা অধিক কাঁদে বলেই পুরুষদের জন্য তা নিন্দনীয় নয়। যেহেতু

এ দুনিয়ায় মহাপুরুষরা কেঁদে গেছেন। মহাপুরুষদের সর্দার কেঁদেছেন। সুতরাং যে পুরুষরা মোটেই কাঁদে না, তারা কী নির্দয় পুরুষ নয়?

বীরপুরুষরাও সময়ে কেঁদে গেছেন। সময়ে যুদ্ধের ময়দানে যুদ্ধ করেছেন এবং সময়ে আল্লাহর নিকট কান্না করেছেন। সুতরাং কান্না মোটেই দুর্বল ব্যক্তিত্বের দলীল নয়।

অনেকের প্রিয়জনদের কেউ মারা গেলে কান্না করে। ইহলৌকিক কারণে কেঁদে বুক ভাসিয়ে দেয়। কিন্তু পারলৌকিক কারণে কাঁদতে পারে না। দুনিয়ার প্রেম-প্রীতির ব্যাপারে অনেকে বড় আবেগময়, কিন্তু আল্লাহর ভয়ে অথবা জাহান্নামের ভয়ে কান্নার ব্যাপারে তারা পাষাণ-দিল।

আবার কেউ জাহান্নামের ভয়ে কাঁদলে বলে, 'কাঁদছ কেন? নিরাশ হয়ো না, আল্লাহর কাছে আশা রাখ।'

কিন্তু সে জানে না যে, আল্লাহর ভয়ে কাঁদার মর্যাদা কী?

কান্নার উপকারিতা

কাঁদলে অনেকের মাথা ধরে ঠিকই, কিন্তু তাতে মানসিক চাপ কমিয়ে দেয়। কাঁদলে মন হাল্কা হয়। অশ্রু মানুষের এমন বন্ধু, যে জীবনের বহু দুঃখ-কষ্টকে হাল্কা ক'রে ফেলে।

দুঃখী মানুষ বলে, 'কান্নায় অনন্ত সুখ আছে, তাইতো কাঁদতে আমি এত ভালোবাসি।' দুঃখের একমাত্র মৌন ভাষা অশ্রু।

তবে কান্নার স্বাস্থ্যগত উপকারও আছে।

চোখের গরম অশ্রু চোখের জন্য উপকারী। তাতে চোখ পরিষ্কার হয় এবং চোখের অনেক রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। অশ্রু হল বৃষ্টির মতো, বৃষ্টি যেমন পৃথিবীর আবর্জনা দূর করে, তেমনি অশ্রুও অক্ষিগোলকের আবর্জনা (ব্যাক্টেরিয়া, গ্যাস, ধোঁয়া, ধূলা ও নানা জীবাণু) ধুয়ে ফেলে। আর তাতে দৃষ্টিশক্তির মোক্ষম উপকার হয়।

মানসিক চাপের কারণে সৃষ্টি হওয়া একাধিক ক্ষতিকর রাসায়নিক ও

বিষাক্ত পদার্থ অশ্রুর সাথে বের হয়ে যায়। মানসিক দুঃখ-ব্যথা চেপে রেখে যেমন মানসিক ব্যাধির সৃষ্টি হয়, কখনও কখনও রক্তচাপ, হার্ট ও সুগারের রোগ আক্রমণ ক'রে বসে, তেমনি চোখের পানি বের না ক'রেও অনেক শারীরিক ব্যাধির সৃষ্টি হয়।

মানসিক অবসাদ ও দুশ্চিন্তার কারণে সৃষ্ট অস্থিরতা দূর করার জন্য অনেকে অনেক রকম ওষুধপত্র ব্যবহার করে। অনেকে মদ বা অন্য মাদকদ্রব্য ভক্ষণ করে। আর তাতে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসাবে অন্য রোগের সৃষ্টি হয়। পক্ষান্তরে কান্না সেই অস্থির মনকে স্থিরতা দান করতে পারে। বিষাদগ্রস্ত কোন কোন মানুষ বলেছেন, 'যদি কান্না না থাকত, তাহলে আমি আত্মহত্যা করতে বাধ্য হতাম!'

শিশুরা কাঁদে এবং তার মাধ্যমে তারা নিজেদের রাগ, ক্ষোভ, অভিমান, চাহিদা ইত্যাদি প্রকাশ ক'রে থাকে। আর এটা তাদের জন্য ভাল। মহিলা কাঁদতে পারে, আর তার মাধ্যমে সে তার রাগ, ক্ষোভ, অভিমান, আবেগ, অনুভূতি ইত্যাদি প্রকাশ ক'রে থাকে। আর তার জন্যই সে পুরুষের তুলনায় অনেক দিন বেশি বাঁচে।

পক্ষান্তরে যারা রাগ, ক্ষোভ, অভিমান ইত্যাদিকে চেপে-ঢেকে রেখে চক্ষুকে কান্না থেকে বিরত রাখে, তার ভিতর কাঁদে। সেই চাপা কান্নার বিষবাষ্প তার হৃদয়ের বিস্ফোরণ ঘটাতে চায়। কিন্তু তা না হতে পেরে সেই দমিত বাষ্প অন্য পথ খোঁজে, যে পথে মানুষের নানা ব্যাধি সৃষ্টি হয়।

আমরা বলে থাকি, 'পেট ফুলে থাকার চেয়ে নেমে যাওয়াই ভাল।' অনুরূপ কান্না চেপে রাখার চেয়ে কেঁদে ফেলাই ভাল।

কান্নার ফলে অনেক মাথার রোগ, চোখের রোগ, হার্টের রোগ, অন্ত্রের রোগ ও গাঁটের রোগ থেকে রেহাই পাওয়া যায়। সুতরাং যে কাঁদতে জানে, সে অনেক রোগের আক্রমণ থেকে মুক্তি লাভ করে।

কান্নার প্রকারভেদ

মানুষ যে সকল কান্না কাঁদে, তার কারণ এক নয়, একাধিক। আর সেই জন্যই কান্নার বিভিন্ন প্রকার রয়েছে। যেমন ঃ-

১। মায়া-কান্না

যে মানুষের হৃদয়ে সৃষ্টির প্রতি দয়া-মায়া বেশি, সে মানুষ এই কান্না কাঁদে। পরের কষ্ট দেখে মনে কষ্ট পায়, পরের বেদনা দেখে মনে দয়া হয়, পরের অভাব দেখে অন্তরে মায়া হয়, আর তাই দেখে কান্নায় চক্ষু ভাসায়।

আমাদের দয়ার নবী ﷺ এমন কান্না উম্মতের জন্য কেঁদেছেন। একদা তিনি ইব্রাহীম ﷺ-এর ব্যাপারে আল্লাহর এ বাণী পাঠ করলেন,

[رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ] (٣٦) سورة إبراهيم

“হে আমার প্রতিপালক! এসব প্রতিমা বহু মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে; সুতরাং যে আমার অনুসরণ করবে সে আমার দলভুক্ত, কিন্তু কেউ আমার অবাধ্য হলে তুমি তো চরম ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।” *(সূরা ইব্রাহীম ৩৬)* এবং ঈসা ﷺ-এর উক্তি (এ আয়াতটি পাঠ করলেন),

[إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ] (١١٨) سورة المائدة

“যদি তুমি তাদেরকে শাস্তি প্রদান কর, তবে তারা তোমার বান্দা। আর যদি তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর, তবে তুমি অবশ্যই প্রবল পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।” *(সূরা মায়েদাহ ১১৮ আয়াত)* অতঃপর তিনি তাঁর হাত দু’খানি উঠিয়ে বললেন, “হে আল্লাহ! আমার উম্মত, আমার উম্মত।”

অতঃপর তিনি কাঁদতে লাগলেন। আল্লাহ আয্যা অজাল্ল বললেন, ‘হে জিব্রীল! তুমি মুহাম্মাদের নিকট যাও---আর তোমার রব বেশী জানেন---তারপর তাকে কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা কর?’ সুতরাং জিব্রীল তাঁর নিকট এলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে সে কথা জানালেন, যা তিনি (তাঁর উম্মত সম্পর্কে) বলেছিলেন---আর আল্লাহ তা অধিক জানেন। অতঃপর আল্লাহ তাআলা বললেন, ‘হে জিব্রীল! তুমি (পুনরায়) মুহাম্মাদের কাছে যাও এবং বল, আমি তোমার উম্মতের ব্যাপারে তোমাকে সন্তুষ্ট ক’রে দেব এবং অসন্তুষ্ট করব না।’ *(মুসলিম)*

একদিন সূর্যে গ্রহণ লাগলে মহানবী ﷺ নামায পড়তে খাড়া হলেন। তাতে তিনি সুদীর্ঘ ক্বিরাআত ক’রে প্রত্যেক রাকআতে লম্বা লম্বা দু’টি ক’রে রুকূ করলেন। এই নামাযে তিনি কাঁদতে লাগলেন আর বলতে লাগলেন, “হে আমার প্রতিপালক! তুমি কি আমাকে ওয়াদা দাওনি যে, আমি ওদের মাঝে থাকা অবস্থায় তুমি ওদেরকে আযাব দেবে না? তুমি কি আমাকে ওয়াদা দাওনি যে, ওদের ক্ষমাপ্রার্থনা করতে থাকা অবস্থায় তুমি ওদেরকে আযাব দেবে না? এই তো আমরা তোমার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করছি।” *(সহীহ আবূ দাউদ ১০৭৯নং)*

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, এক মিসকীন মহিলা তার দু’টি কন্যাকে (কোলে) বহন ক’রে আমার কাছে এল। আমি তাকে তিনটি খুরমা দিলাম। অতঃপর সে তার কন্যা দু’টিকে একটি একটি ক’রে খুরমা দিল এবং সে নিজে খাবার জন্য একটি খুরমা মুখ-পর্যন্ত তুলল। কিন্তু তার কন্যা দু’টি সেটিও খেতে চাইল। সুতরাং মহিলাটি যে খেজুরটি নিজে খেতে ইচ্ছা করেছিল সেটিকে দু’ভাগে ভাগ ক’রে তাদের মধ্যে বন্টন ক’রে দিল। (আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আন্হা বলেন,) তার (এ) অবস্থা আমাকে অভিভূত করল। সুতরাং আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট মহিলাটির ঘটনা বর্ণনা করলাম। নবী ﷺ বললেন, “নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তার জন্য তার এ কাজের বিনিময়ে জান্নাত ওয়াজিব ক’রে

দিয়েছেন অথবা তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত ক'রে দিয়েছেন।" *(মুসলিম)*

এক বর্ণনায় আছে, মা আয়েশা ঐ মহিলা ও তার মেয়েদের অভাব ও ক্ষুধা দেখে কাঁদতে লাগলেন। অতঃপর নবী ﷺ বাসায় এলে তিনি তাঁকে কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। মা আয়েশা উক্ত ঘটনা বর্ণনা করলে নবী ﷺ ঐ হাদীস বর্ণনা করলেন। *(মুসনাদ ত্বায়ালিসী ১/২০৪)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, নবী ﷺ বললেন, "যাকে এই কন্যা সন্তান দিয়ে কোন পরীক্ষায় ফেলা হয়, তারপর যদি সে তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করে, তাহলে এ কন্যারা তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে অন্তরাল হবে।" *(বুখারী, মুসলিম)*

কন্যা-সন্তান দিয়ে পরীক্ষায় ফেলা এই জন্য হয় যে, সাধারণতঃ মানুষ এমনকি মেয়ে মানুষ নিজেও কন্যা-সন্তান পছন্দ করে না। যেহেতু কন্যার পিছনে ব্যয় আছে, কোন আয় নেই। এটাই অধিকাংশ হয়ে থাকে। মহান আল্লাহ সেই মানুষদের কথা বলেছেন,

[وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ] (٥٨) النحل

অর্থাৎ, তাদের কাউকে যখন কন্যা-সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয়, তখন তার মুখমন্ডল কাল হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়। *(নাহল ঃ ৫৮)*

যৌতুক ও পণপ্রথার বর্তমান যুগে বহু মেয়ের মা-বাপের অবস্থা ও মা-মেয়ের কান্না দেখে অবশ্যই মায়ায় কান্না আসার কথা।

২। প্রেম-ভালবাসার কান্না

মানুষ যাকে ভালবাসে তার নৈকট্যলাভের আকাঙ্ক্ষায় অথবা বিচ্ছিন্নতার আশঙ্কায় কাঁদে। যার প্রেম যত গভীর, সে তত কাঁদতে থাকে।

আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ বলেন, একদা নবী ﷺ তাঁর ভাষণে বললেন, "আল্লাহ এক বান্দাকে দুনিয়া ও তাঁর কাছে যা আছে তার মাঝে এখতিয়ার দিয়েছেন। বান্দা তাঁর কাছে যা আছে, তা এখতিয়ার ক'রে নিয়েছে।" এ কথা শুনে আবূ বাক্র ﷺ কাঁদতে লাগলেন। আমি মনে

মনে বললাম, এ বৃদ্ধ কাঁদছেন কেন? আল্লাহ তো এক বান্দাকে দুনিয়া ও তাঁর কাছে যা আছে তার মাঝে এখতিয়ার দিয়েছেন। আর বান্দা তাঁর কাছে যা আছে, তা এখতিয়ার ক'রে নিয়েছে। (তাতে কাঁদার কী আছে?) কিন্তু আল্লাহর রসূল ﷺ ছিলেন সেই বান্দা। আর আবু বাক্র ছিলেন আমাদের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী। *(বুখারী প্রমুখ)*

আসলে কেউ না বুঝলেও আবূ বাক্র বুঝেছিলেন যে, তাঁর প্রিয়তম ব্যক্তিত্বকে এ দুনিয়া থেকে তুলে নেওয়া হবে। প্রিয় হাবীব এ দুনিয়া থেকে চলে যাবেন। তাই তিনি কেঁদে উঠলেন।

ভালবাসার টানে কেঁদে ওঠে মন। ভালবাসার জিনিস হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় অন্তরে মোচড় সৃষ্টি হয়। আর তার ফলেই অস্থিরতায় কান্না আসে।

আওফ ইবনে মালিক ইবনে তুফাইল বলেন, আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)র সামনে ব্যক্ত করা হল যে, আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) যে (নিজ বাড়ি) বিক্রয় বা দান করেছেন, সে সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর ﷺ বলেছেন যে, 'হয় (খালাজান) আয়েশা (অবাধে দান-খয়রাত করা হতে) অবশ্যই বিরত থাকুন, নচেৎ তাঁর উপর (আর্থিক) অবরোধ প্রয়োগ করবই।' আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এই বক্তব্য শুনে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সত্যিই কি সে এ কথা বলেছে?' লোকেরা বলল, 'হ্যাঁ।' তিনি বললেন, 'তাহলে আমি আল্লাহর নামে মানত করলাম যে, এখন থেকে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইরের সাথে কখনও কথা বলব না।' তারপর যখন বাক্যালাপ ত্যাগ দীর্ঘ হয়ে গেল, তখন আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর আয়েশার নিকট (এ ব্যাপারে) সুপারিশ করালেন। আয়েশা বললেন, 'আল্লাহর কসম! আমি ইবনে যুবাইরের সম্পর্কে কোন সুপারিশ গ্রহণ করব না, আর আপন মানত ভঙ্গও করব না।' বস্তুতঃ যখন ব্যাপারটা ইবনে যুবাইরের উপর অতীব দীর্ঘ হয়ে পড়ল, তখন তিনি মিসওয়ার ইবনে মাখরামাহ ও আব্দুর রাহমান ইবনে আসওয়াদ ইবনে আব্দে ইয়াগুস সাহাবীদের সঙ্গে আলোচনা করলেন এবং তাঁদেরকে বললেন, 'আমি তোমাদেরকে

আল্লাহর কসম দিচ্ছি যে, তোমরা (আমার স্নেহময়ী খালা) আয়েশার কাছে আমাকে নিয়ে চল। কেননা, আমার সাথে বাক্যালাপ বন্ধ রাখার মানতে অটল থাকা তাঁর জন্য আদৌ বৈধ নয়।' সুতরাং মিসওয়ার ও আব্দুর রহমান উভয়েই ইবনে যুবাইর ﷺ-কে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। এমনকি শেষ পর্যন্ত ভিতরে প্রবেশ করার জন্য আয়েশার নিকট অনুমতিও চাইলেন এবং বললেন, 'আসসালামু আলাইকি অরাহ্‌মাতুল্লাহি অবারাকা-তুহ!' আমরা কি ভিতরে আসতে পারি? আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, 'হ্যাঁ এস।' বললেন, 'আমরা সকলেই কি?' আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, 'হ্যাঁ, সকলেই প্রবেশ কর।' কিন্তু তিনি জানতেন না যে, ওই দু'জনের সঙ্গে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর ﷺও উপস্থিত আছেন। সুতরাং এঁরা যখন ভিতরে ঢুকলেন, তখন আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর পর্দার ভিতরে চলে গেলেন এবং (খালা) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)কে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে আল্লাহর শপথ দিতে লাগলেন। এ দিকে পর্দার বাইরে থেকে মিসওয়ার ও আব্দুর রহমান উভয়েই আয়েশাকে কসম দিয়ে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইরের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে ও তাঁর ওযর গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন এবং বললেন, 'নবী ﷺ বাক্যালাপ বন্ধ রাখতে নিষেধ করেছেন, যে সম্বন্ধে আপনি অবহিত। আর কোন মুসলমানের জন্য এটা বৈধ নয় যে, সে তার ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশী কথাবার্তা বন্ধ রাখে।' সুতরাং যখন তাঁরা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)র সামনে উপদেশ ও সম্পর্ক ছিন্ন করা যে গুনাহর কাজ---তা বারবার বলতে লাগলেন, তখন তিনিও উপদেশ আরম্ভ করলেন এবং কাঁদতে লাগলেন। তিনি বলতে লাগলেন, 'আমি তো মানত মেনেছি। আর মানতের ব্যাপারটা বড় শক্ত।' কিন্তু তাঁরা তাঁকে অব্যাহতভাবে বুঝাতে থাকলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি (আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা) আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইরের সাথে কথা বললেন এবং স্বীয় মানত ভঙ্গ করার কাফ্‌ফারা স্বরূপ চল্লিশটি গোলাম মুক্ত করলেন। তারপর থেকে তিনি

যখনই উক্ত মানতের কথা স্মরণ করতেন, তখনই এত বেশী কাঁদতেন যে, চোখের পানিতে তাঁর ওড়না ভিজে যেত। *(বুখারী)*

স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসার সম্পর্ক সবচেয়ে গভীর। সেই ভালবাসায় যদি কেউ আঘাত পায় অথবা ধোঁকা খায় অথবা প্রত্যাখ্যান বা উপেক্ষা পায়, তাহলেই মানুষ কাঁদতে লাগে।

বিভিন্ন দেশ জয়লাভ করার পর যখন মুসলিমদের অবস্থা পূর্বের তুলনায় কিছুটা সচ্ছল হল, তখন মুহাজির ও আনসারদের স্ত্রীদের দেখাদেখি মহানবী ﷺ-এর স্ত্রীগণও খোরপোষের পরিমাণ বৃদ্ধির দাবী জানালেন। নবী ﷺ যেহেতু বিলাসহীন জীবন-যাত্রা পছন্দ করতেন, সেহেতু স্ত্রীদের এই দাবীতে বড় দুঃখিত হলেন এবং এক মাসের জন্য স্ত্রীদের নিকট থেকে আলাদা হয়ে একাকী বাস করলেন। অবশেষে আল্লাহ তাআলা এই আয়াত অবতীর্ণ করলেন। উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর সর্বপ্রথম তিনি আয়েশা (রাঃ) কে উক্ত আয়াত শুনিয়ে তাঁকে তাঁর সংসারে থাকা ও না থাকার ব্যাপারে এখতিয়ার দিলেন এবং বললেন, নিজে সিদ্ধান্ত না নিয়ে পিতা-মাতার পরামর্শ নিয়ে যা করার করবে। আয়েশা (রাঃ) বললেন, আপনার বিষয়ে পরামর্শ নেব, তা কী ক'রে হয়? বরং আমি আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে পছন্দ করি। অন্য সকল স্ত্রীগণও এই একই মত ব্যক্ত করলেন এবং কেউ নবী ﷺ-কে ত্যাগ ক'রে পার্থিব প্রাচুর্য ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে প্রাধান্য দিলেন না। এই ঘটনায় হাফসা (রাঃ) কেঁদেছিলেন। *(বুখারী, তাফসীর সূরা আহযাব)*

স্বামী, আবার স্বামীর মতো স্বামী যদি প্রত্যাখ্যান করতে চায়, তাহলে কান্নায় বুক তো ভাসবেই।

পক্ষান্তরে যে স্ত্রীকে স্বামী ভালবাসে, কিন্তু স্ত্রী কোন কারণে স্বামীকে উপেক্ষা করে, তাহলে স্বামীও কাঁদে। ক্রীতদাসী বারীরার স্বামী মুগীস কৃষ্ণকায় ক্রীতদাস ছিল। এক সময় বারীরা স্বাধীন হয়ে গেল। আর স্ত্রী স্বাধীন হলে দাম্পত্যে তার এখতিয়ার থাকে। সে ইদ্দত পালন ক'রে ভিন্ন

স্বাধীন স্বামী গ্রহণ করতে পারে। সুতরাং বারীরা মুগীসকে বর্জন করতে চাইল। কিন্তু মুগীস তাকে খুব ভালবাসত। সে কেঁদে কেঁদে বারীরার পিছনে পিছনে ফিরে তার স্ত্রীরূপে থাকতে আকুল আবেদন জানাতে লাগল। মুগীস এত কাঁদা কাঁদতে লাগল যে, তাতে তার দাড়ি পর্যন্ত ভিজে যেতে লাগল। শেষ পর্যন্ত আল্লাহর রসূল ﷺ দ্বারা সুপারিশ করানোর পরেও যখন বারীরা তাকে উপেক্ষাই করল, তখন তার দুঃখ রাখার কি কোন ঠাঁই ছিল?

মুগীসের এই ভালবাসা এবং বারীরার এই প্রত্যাখ্যান দেখে মহানবী ﷺ বড় আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন। *(বুখারী-মুসলিম)*

বাংলা প্রবাদে আছে, 'চুল থাকে তো বাঁধি, গুণ থাকে তো কাঁদি।' গুণেভরা স্ত্রীর কথা স্মরণ করেও কাঁদে মানুষ। প্রেমময়ী সেই স্ত্রীর কোন স্মৃতি দর্শন করলেও তাকে হারানোর শোকে কান্না আসে।

মহানবী ﷺ-এর জামাতা তখন মুশরিক ছিলেন। বদর যুদ্ধে বন্দী হয়ে মদীনায় ছিলেন। তাঁর কন্যা যয়নাব স্বামীর মুক্তিপণ হিসাবে সঙ্গে এনেছিলেন মায়ের মীরাসে পাওয়া একটি হার। এ ছাড়া দেওয়ার মতো কিছু ছিলও না তাঁর কাছে। সেই হার দর্শন ক'রে প্রেমময়ী, পুণ্যময়ী, পতিপ্রাণা খাদীজার কথা স্মরণ হয়ে গেল মহানবী ﷺ-এর। সুতরাং তিনি কাঁদতে লাগলেন। কাঁদতে লাগলেন পরকালগত সেই গুণবতী স্ত্রীর কথা মনে ক'রে।

৩। খুশীর কান্না

কষ্ট ও দুঃখের খবর শুনে যেমন মানুষ কাঁদে, তেমনি খুব খুশী ও আনন্দের খবর শুনেও মানুষ কেঁদে ফেলে।

তোমার কৃতিত্বের জন্য তুমি এক লক্ষ টাকা পুরস্কার পেয়েছ!

যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত ছিল। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট থেকে তোমার স্বামী বেকসুর খালাস পেয়েছে!

পঞ্চাশ হাজার টাকার দামের গয়নাটা বালির নিচে পাওয়া গেছে!

জাহাজ-দুর্ঘটনায় সমস্ত যাত্রী মারা গেছে বলে খবরে প্রকাশ, কিন্তু

তোমার ছেলে বেঁচে আছে!

এই শ্রেণীর খবর শুনে মানুষ বেহদ্দ খুশীতে কেঁদে ফেলে। নিম্নে কিছু নমুনা প্রদত্ত হল ঃ-

আবূ হুরাইরা ﷺ আম্মাকে ইসলামের দাওয়াত দিতেন। আম্মা রেগে উঠে আল্লাহর নবী ﷺ-কে গালাগালি করতেন! আবূ হুরাইরা ﷺ কেঁদে মহানবী ﷺ-কে ঘটনা খুলে বলে তাঁর জন্য হিদায়াতের দুআ করতে বললেন। তিনি দুআ করলেন। আবূ হুরায়রা ﷺ দুআর মাঝে সুসংবাদ নিয়ে বাসায় ফিরে গিয়ে দেখলেন দরজা বন্ধ আছে। শুনতে পেলেন, পানি পড়ার শব্দ হচ্ছে। মা তাঁর পায়ের শব্দ শুনতে পেয়ে বললেন, 'একটু থামো আবূ হুরাইরা!'

সুতরাং তিনি গোসল ক'রে জামা পরে মাথায় ওড়না না নিয়েই দরজা খুললেন। অতঃপর বললেন, 'আবূ হুরাইরা! আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, অআশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু অরাসূলুহু।'

আবূ হুরাইরা কাল বিলম্ব না ক'রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ফিরে গিয়ে খুশীতে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! সুসংবাদ নিন, আল্লাহ আপনার দুআ কবুল করেছেন এবং আবূ হুরাইরার মা-কে হিদায়াত করেছেন!'

এ খবর শুনে নবী ﷺ আল্লাহর প্রশংসা করলেন। *(মুসলিম)*

একদা নবী ﷺ স্বপ্নের কথা উল্লেখ ক'রে বললেন, 'দেখলাম, আমি জান্নাতে প্রবেশ করেছি। মহলের এক পাশে একটি মহিলা ওযূ করছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, মহলটি কার? বলল, এটি উমার বিন খাত্তাবের। সুতরাং আমি তার ঈর্ষার কথা স্মরণ ক'রে পিছু ফিরে প্রস্থান করলাম।'

এ কথা শুনে উমার ﷺ কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন, 'আপনার প্রতিও কি ঈর্ষা করব? হে আল্লাহর রসূল!' *(বুখারী-মুসলিম)*

আনাস ﷺ বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ উবাই ইবনে কা'ব ﷺ-কে বললেন, আল্লাহ আমাকে আদেশ করলেন যে, আমি তোমাকে 'সূরা লাম

য়্যাকুনিল্লাযীনা কাফারু’ পড়ে শুনাই। কা’ব বললেন, (আল্লাহ কি) আমার নাম নিয়েছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর উবাই (খুশীতে) কাঁদলেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে, উবাই কাঁদতে লাগলেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

হিজরতের সময় মহানবী ﷺ যখন আবু বাক্র ؓ-কে সঙ্গী বানিয়েছিলেন, তখন তিনি অত্যন্ত খুশীতে কেঁদেছিলেন। আয়েশা বলেন, ‘আমার ধারণায় ছিল না যে, মানুষ খুশীতেও কাঁদে। কিন্তু যখন তাঁকে কাঁদতে দেখলাম, তখন তা জানতে পারলাম।’ *(মুসনাদে ইসহাক রাহওয়াইহ ২/৫৮৪, ফাতহ ১১/২৩৬)*

মহানবী ﷺ যেদিন মদীনায় পদার্পণ করেছিলেন, সেদিন (মদীনাবাসী) আনসার খুশীতে কেঁদেছিলেন।

একদা আল্লাহর নবী ﷺ বললেন, “আবু বাকরের ধন-সম্পদ যেভাবে আমাকে উপকৃত করেছে, অন্য কোন ধন-সম্পদ তা করেনি।”

এ কথা শুনে আবূ বাক্র ؓ কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, ‘আমি ও আমার ধন-সম্পদ তো আপনার জন্যই হে আল্লাহর রসূল!’

এ কথা শুনে উমার ؓ কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, ‘আমার আব্বা তোমার জন্য কুরবান হোক হে আবু বাক্র! যে কোন কল্যাণে আমি তোমার সাথে প্রতিযোগিতায় নেমেছি, তাতেই তুমি প্রথম স্থান দখল ক’রে নিয়েছ!’ *(উসুদুল গাবাহ প্রমুখ)*

হাম্মাদ বলেন, ইব্রাহীম নখয়ী অত্যাচারী রাজা হাজ্জাজ বিন ইউসুফের মৃত্যু-সংবাদ শুনে খুশীতে কেঁদেছিলেন। *(ত্বাবাক্বাত সা’দ ৬/২৮০)*

৪। অসহনীয় কষ্টের কান্না

অনেক সময় দৈহিক অথবা মানসিক এমন কষ্ট হয়, যার ফলে মানুষ কাঁদে। যেহেতু কাঁদলে কষ্ট হাল্কা হয়। অবশ্য এমন কান্না না কেঁদে ধৈর্য ধারণ করাই শ্রেয়।

মানসিক ব্যথা-বেদনায় কেঁদেছিলন মা আয়েশা। তাঁর চরিত্রে অপবাদ রটলে সত্যতা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর পিতা-মাতার নিকট

যাওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুমতি চাইলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে অনুমতি প্রদান করলে তিনি পিতামাতার নিকট গমন করলেন। আম্মা উম্মে রুমানকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, ‘বেটি! কোন পুরুষের কাছে সতীনের সংসারে সুন্দরী সুপ্রিয়া স্ত্রী থাকলে (হিংসায়) লোকে অনেক কথাই বলে।’

আব্বাকে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি কেঁদে ফেললেন। অতঃপর পরিস্থিতি সম্পর্কে নিশ্চিতরূপে অবগত হয়ে মা আয়েশা (রাঃ) কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। নিরবচ্ছিন্ন কান্নার মধ্যে তাঁর দুই রাত ও এক দিন অতিবাহিত হয়ে গেল। এ সময়ের মধ্যে ক্ষণিকের জন্যও তাঁর অশ্রুধারা বন্ধ হয়নি কিংবা ঘুমও আসেনি। তাঁর এ রকম একটা উপলব্ধি হচ্ছিল যে, কান্নার চোটে তাঁর কলিজা এক্ষণে ফেটে যাবে।

ঘটনার নানা তদন্তের পর একদিন আসরের নামায পড়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ আয়েশা (রাঃ)এর নিকট আগমন করলেন এবং কলেমা শাহাদত সমন্বয়ে এক সংক্ষিপ্ত ভাষণ প্রদান করলেন। অতঃপর ইরশাদ করলেন, “হে আয়েশা! তোমার সম্পর্কে কিছু জঘন্য কথাবার্তা আমার কানে এসেছে। যদি তুমি উক্ত কাজ থেকে পবিত্র থাক, তাহলে আল্লাহ তাআলা অনুগ্রহ ক’রে এর সত্যতা প্রকাশ ক’রে দেবেন। আর আল্লাহ না করুন, তোমার দ্বারা যদি কোন পাপকার্য হয়েই থাকে, তাহলে তুমি আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা ও তওবা কর। কারণ, পাপকার্যের পর কোন বান্দা যখন অনুতপ্ত হয়ে খালেস অন্তরে আল্লাহর দরবারে তওবা করে, তিনি তা কবূল করেন।”

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বক্তব্য শোনার পর আয়েশা (রাঃ)এর অশ্রুধারা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে গেল। তাঁর চোখে তখন এক ফোঁটাও পানি যেন অবশিষ্ট ছিল না। তিনি তাঁর পিতা-মাতাকে বললেন যে, তাঁদেরকেই নবী ﷺ-এর প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। কিন্তু জবাব দেওয়ার মত কোন ভাষাই যেন তাঁরা খুঁজে পেলেন না। পিতা-মাতাকে অত্যন্ত অসহায় এবং নির্বাক দেখে আয়েশা (রাঃ) নিজেই মুখ খুলে বললেন, ‘আল্লাহর কসম!

আপনারা যে কথা শুনেছেন, তা আপনাদের অন্তরকে প্রভাবিত করেছে এবং আপনারা তাকে সত্য বলে মেনে নিয়েছেন। অতএব আমি যদি বলি যে, আমি সম্পূর্ণ পাক-পবিত্র আছি এবং আল্লাহ অবশ্যই অবগত আছেন যে, আমি পবিত্র আছি, তবুও আপনারা আমার কথাকে সত্য বলে মেনে নেবেন না। আর যদি আমি ঐ জঘন্য অপবাদকে সত্য বলে স্বীকার করে নিই, অথচ আল্লাহ তাআলা অবগত আছেন যে, আমি তা থেকে পবিত্র আছি, তবে আপনারা আমার কথাকে সত্য বলে মেনে নেবেন। এ মত অবস্থায় আল্লাহর কসম! আমার ও আপনাদের জন্য ঐ কথাই প্রযোজ্য হবে বা ইউসুফ ﷺ-এর পিতা বলেছিলেন,

[فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ] (١٨) سورة يوسف

অর্থাৎ, ধৈর্য ধারণই উত্তম পথ। আর তোমরা যা বলছ, তার জন্য আমি আল্লাহর সাহায্য কামনা করছি।' *(সূরা ইউসুফ ১৮ আয়াত)*

এরূপই এক মানসিক দহন-যন্ত্রণায় কেঁদেছিলেন সাহাবী কা'ব বিন মালেক। যখন তিনি তবূক যুদ্ধে অংশগ্রহণ না ক'রে মদীনায় থেকে গিয়েছিলেন এবং তার ফলে শাস্তি স্বরূপ মহানবী ﷺ তিনি ও তাঁর সঙ্গীদের বিরুদ্ধে বয়কট ঘোষণা করেছিলেন।

৫। শোকতাপের কান্না

কোন প্রিয়জন হারানোর শোকে কান্না

মানুষের ইতিহাসে সবচেয়ে করুণ কান্না পুত্র ইউসুফকে হারানোর শোকে পিতা ইয়াকূব ﷺ-এর কান্না। যে কান্নার ব্যাপারে কুরআন বলে,

[وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ] ﴿يوسف:٨٤﴾

অর্থাৎ, শোকে তার চক্ষুদ্বয় সাদা হয়ে গিয়েছিল এবং সে ছিল অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট। *(ইউসুফ ঃ ৮৪)*

বরং বলা হয় যে, তাঁর কান্নাতে ফিরিশ্তাও শরীক হয়েছিলেন!

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ﷺ বলেন, সা'দ ইবনে উবাদাহ ﷺ একবার

পীড়িত হলে আব্দুর রহমান ইবনে আওফ, সা'দ ইবনে আবী অক্কাস এবং আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ ﷺদের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নিকট কুশল জিজ্ঞাসার জন্য গেলেন। যখন তিনি তাঁর নিকট উপস্থিত হলেন, তখন তাঁকে অজ্ঞান অবস্থায় পেলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "ও কি মারা গেছে?" লোকেরা জবাব দিল, 'হে আল্লাহর রসূল! না (মারা যায়নি)।' তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ কেঁদে ফেললেন। সুতরাং লোকেরা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কান্না করতে দেখল, তখন তারাও কাঁদতে লাগল। তিনি বললেন, "তোমরা কি শুনতে পাও না? নিঃসন্দেহে আল্লাহ চোখের অশ্রু ঝরাবার জন্য শাস্তি দেন না এবং আন্তরিক দুঃখ প্রকাশের জন্যও শাস্তি দেন না। কিন্তু তিনি তো এটার কারণে শাস্তি দেন অথবা দয়া করেন।" এই বলে তিনি নিজ জিভের প্রতি ইঙ্গিত করলেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

উসামাহ ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট তাঁর নাতিকে তার মুমূর্ষ অবস্থায় আনা হল। (ওকে দেখে) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চক্ষুদ্বয় হতে অশ্রু ঝরতে লাগল। সা'দ বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! এ কী?' তিনি বললেন, "এটা রহমত (দয়া); যা আল্লাহ তাঁর বান্দাদের অন্তরে রেখেছেন। আর আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে দয়ালুদের প্রতিই দয়া করেন।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পুত্র ইব্রাহীমের নিকট গেলেন, যখন সে মারা যাচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দু'চোখ দিয়ে অশ্রুপাত হতে লাগল। আব্দুর রহমান ইবনে আওফ তাঁকে বললেন, 'আপনিও (কাঁদছেন)? হে আল্লাহর রসূল!' তিনি ﷺ বললেন, "হে আওফের পুত্র! এটা দয়া।" অতঃপর দ্বিতীয়বার কেঁদে ফেললেন। তারপর বললেন, "চোখ অশ্রুপাত করছে এবং অন্তর দুঃখিত হচ্ছে। আমরা সে কথাই বলব, যা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করবে। আর হে ইব্রাহীম! আমরা তোমার বিরহে দুঃখিত।" *(বুখারী, মুসলিম কিছু অংশ)*

আনাস ﷺ বলেন, 'নবী ﷺ এর এক কন্যা (উম্মে কুলষূম)এর দাফন কার্যের সময় আমি উপস্থিত ছিলাম। দেখলাম, আল্লাহর রসূল ﷺ কবরের

পাশে বসে আছেন। আর তাঁর চোখ দু'টি অশ্রুসিক্ত ছিল। অতঃপর (লাশ নামানোর সময়) তিনি বললেন, "তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে (গত) রাত্রে স্ত্রী সহবাস করেনি?" আবু তালহা বললেন, 'আমি আছি, হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "তাহলে তুমি ওর কবরে নামো।" এ কথা শুনে আবূ তালহা কবরে নামলেন। *(বুখারী ১২৮৫নং, হাকেম ৪/৪৭, বাইহাকী ৪/৫৩, আহমাদ ৩/১২৬ প্রমুখ)*

সাহাবী জাবের ﷺ বলেন, 'যখন আমার পিতা (আব্দুল্লাহ) ইন্তিকাল করলেন, তখন আমি তাঁর চেহারা থেকে কাপড় সরিয়ে কাঁদতে লাগলাম। এ দেখে সকলে আমাকে নিষেধ করল। কিন্তু নবী ﷺ আমাকে নিষেধ করেন নি। অতঃপর নবী ﷺ-এর আদেশক্রমে তাঁর জানাযা উঠানো হল। এতে আমার ফুফু ফাতেমা কাঁদতে শুরু করলেন। নবী ﷺ তাঁকে বললেন, "কাঁদ অথবা না কাঁদ, ওর লাশ উঠানো পর্যন্ত ফিরিশ্তাবর্গ নিজেদের পক্ষ দ্বারা ওকে ছায়া করে রেখেছিল।" *(বুখারী, মুসলিম, প্রমুখ)*

মা আয়েশা ﷺ বলেন, 'উষমান বিন মাযঊন মারা গেলে নবী ﷺ তাঁকে দেখতে গেলেন। তিনি তাঁর চেহারার কাপড় খুলে ঝুঁকে তাঁকে চুম্বন করলেন। অতঃপর তিনি এমন কাঁদলেন যাতে দেখলাম, তাঁর চোখের পানি তাঁর গাল বেয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে।' *(তিরমিযী, আবু দাউদ, সহীহ ইবনে মাজাহ ১৪৫৬নং)*

প্রায় এক হাজার সাহাবা সহ এক সফরের এক মঞ্জিলে নেমে নবী ﷺ দু'রাকআত নামায পড়লেন। অতঃর তিনি আমাদের দিকে মুখ ফিরালে আমরা দেখলাম, তাঁর দু'টি চোখ বেয়ে পানি ঝরছে। তাঁর কান্না দেখে সাহাবাগণ কাঁদতে লাগলেন। উমার ﷺ তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, 'আমার মা-বাপ আপনার জন্য কুরবান হোক, হে আল্লাহর রসূল! আপনার কী হয়েছে? (আপনি কাঁদছেন কেন?)' তিনি বললেন, "আল্লাহর নিকট আমি আমার মায়ের কবর যিয়ারতের অনুমতি চাইলে তিনি আমাকে যিয়ারতের অনুমতি দিলেন। কিন্তু তাঁর জন্য ক্ষমা প্রার্থনার অনুমতি চাইলে তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন না। তাই আমি তাঁর উপর জাহান্নামের ভয়ে কাঁদছি!......" *(আহমাদ, মুসলিম, প্রমুখ)*

মু'তা যুদ্ধে যায়দ, জা'ফর ও আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) শহীদ হলে অহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত খবর মহানবী ﷺ মদীনায় বলতে লাগলেন, "যায়দ পতাকা ধারণ ক'রেছিল, সে শহীদ হয়ে গেল। তারপর জা'ফর পতাকা ধারণ করেছিল, সে শহীদ হয়ে গেল। তারপর আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহাহ পতাকা ধারণ করেছিল, সেও শহীদ হয়ে গেল। তারপর আল্লাহর এক তরবারি খালেদ বিন অলীদ পতাকা ধারণ করল এবং আল্লাহ তার হাতে বিজয় দান করলেন।" এ কথা তিনি বলছিলেন, আর তাঁর চক্ষুদ্বয় হতে অশ্রু ঝরছিল। *(বুখারী)*

উহুদ যুদ্ধের পর মহানবী ﷺ ময়দানে নেমে শহীদদের খোঁজ-খবর নিচ্ছিলেন। কিয়ৎক্ষণ পর দেখলেন তাঁর চাচা আসাদুল্লাহ হামযাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব ﷺ খুন হয়ে গেছেন, তাঁর নাক ও কান কেটে নেওয়া হয়েছে! তাঁর পেট কাটা আছে, কলিজা বের ক'রে চিবানো হয়েছে! এ মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে তিনি কাঁদতে লাগলেন এবং তাঁর করুণ কান্না দেখে সাথী সাহাবাগণও কাঁদতে লাগলেন। রাযিয়াল্লাহু আনহুম।

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) বলেন, নবী ﷺ-এর স্ত্রীরা সকলেই তাঁর কাছে ছিল। ইত্যবসরে ফাতেমা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) হেঁটে (আমাদের নিকট) এল। তার চলন এবং আল্লাহর রসূল ﷺ-এর চলনের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। অতঃপর নবী ﷺ তাকে দেখে স্বাগত জানালেন এবং বললেন, আমার কন্যার শুভাগমন হোক। অতঃপর তিনি তাকে নিজের ডান অথবা বাম পাশে বসালেন। তারপর তিনি তাকে কানে কানে গোপনে কিছু বললেন। ফাতেমা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) জোরেশোরে কাঁদতে আরম্ভ করল। সুতরাং তিনি তার অস্থিরতা দেখে পুনর্বার তাকে কানে কানে কিছু বললেন। ফলে (এবার) সে হাসতে লাগল। (আয়েশা বলেন,) অতঃপর আমি ফাতেমাকে বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্ত্রীদের মাঝে (তাদেরকে বাদ দিয়ে) তোমাকে গোপনে কিছু বলার জন্য বেছে নেওয়া সত্ত্বেও তুমি কাঁদছ? তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন উঠে গেলেন, তখন আমি তাকে বললাম, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাকে কী বললেন?' সে বলল, 'আমি

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গোপন কথা প্রকাশ করব না।' অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইন্তেকাল করলেন, আমি ফাতেমাকে বললাম, 'তোমার প্রতি আমার অধিকার রয়েছে। তাই আমি তোমাকে কসম দিয়ে বলছি যে, তুমি আমাকে বল, রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাকে কী বলেছিলেন?' সে বলল, 'এখন বলতে কোন অসুবিধা নেই। আল্লাহর রসূল ﷺ প্রথমবারে কানাকানি করার সময় আমাকে সংবাদ দিয়েছিলেন যে, "জিব্রাঈল ﷺ প্রত্যেক বছর একবার (অথবা দু'বার) করে কুরআন শোনান। কিন্তু এখন তিনি দু'বার শুনালেন। সুতরাং আমি বুঝতে পারছি যে, আমার মৃত্যু সন্নিকটে। সুতরাং তুমি (হে ফাতেমা!) আল্লাহকে ভয় কর এবং ধৈর্য ধারণ কর। কেননা, আমি তোমার জন্য উত্তম অগ্রগামী।" সুতরাং আমি (এ কথা শুনে) কেঁদে ফেললাম, যা তুমি দেখলে। অতঃপর তিনি আমার অস্থিরতা দেখে দ্বিতীয়বার কানে কানে বললেন, "হে ফাতেমা! তুমি কি এটা পছন্দ কর না যে, মু'মিন নারীদের তুমি সর্দার হবে অথবা এই উম্মতের নারীদের সর্দার হবে?" সুতরাং (এমন সুসংবাদ শুনে) আমি হাসলাম, যা তুমি দেখলে। *(বুখারী, শব্দাবলী মুসলিমের)*

মা আয়েশা ﷺ বলেন, 'আবু বাকর ﷺ তাঁর বাসা সুন্হ থেকে ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে এলেন। ঘোড়া থেকে নেমে মসজিদে প্রবেশ করলেন। অতঃপর নবী ﷺ এর নিকট গেলেন। তিনি তখন চেককাটা ইয়ামানী চাদরে ঢাকা ছিলেন। আব্বা (আবু বাকর) তাঁর চেহারার কাপড় খুলে দিয়ে ঝুঁকে পড়ে তাঁর দুই চক্ষের মাঝে চুম্বন করলেন এবং কাঁদতে লাগলেন। অতঃপর বললেন, 'আমার মা ও বাপ আপনার জন্য কুরবান হোক, হে আল্লাহর নবী! আল্লাহ আপনার মধ্যে দু'টি মরণ একত্রিত করবেন না। এখন যে মরণ আপনার উপর অবধার্য ছিল, তা আপনি বরণ ক'রে নিয়েছেন।'

অন্য এক বর্ণনাতে তিনি বললেন, 'আপনি সেই মৃত্যু বরণ করে নিয়েছেন যার পর আর কোন মৃত্যু নেই।' *(বুখারী ১২৪২নং, নাসাঈ, প্রমুখ)*

কোন মর্যাদা বা কল্যাণ হাতছাড়া হওয়ার শোকে কান্না

মক্কায় আল্লাহর রসূল ﷺ অসুস্থ সা'দ বিন আবী অক্কাসের সাথে দেখা

করতে গেলেন। তিনি কাঁদতে লাগলে আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "তুমি কাঁদছ কী কারণে?' তিনি বললেন, 'আমার আশঙ্কা হয় যে, সেই মাটিতে আমার মরণ হবে, যে মাটি থেকে আমি হিজরত ক'রে গেছি।' *(বুখারী, আদাব)*

মহানবী ﷺ আলী ﷺ-কে মদীনায় নায়েব বানিয়ে তবূক যুদ্ধে বের হয়ে যাচ্ছেন। আলী বলছেন, 'আমি আপনার সাথে যুদ্ধে যেতে চাই।' আল্লাহর নবী ﷺ বলছেন, "না।" তিনি কাঁদছেন। মহানবী ﷺ তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন, "তুমি কি চাও না যে, হারূন যেমন মূসার নায়েব হয়েছিলেন, তুমি তেমনি আমার নায়েব হবে? তবে আমার পরে কোন নবী নেই।" *(মুসলিম)*

অনেকে দান ক'রে বড় বড় মর্যাদার অধিকারী হন, অনেকে দান করতে পারেন না বলে দুঃখে কান্না করেন। মহান আল্লাহ বলেন,

[وَلاَ عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّواْ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلاَّ يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ] (٩٢) سورة التوبة

অর্থাৎ, আর ঐ লোকদেরও (বিরুদ্ধে অভিযোগের কোন পথ) নেই, যারা তোমার নিকট এই উদ্দেশ্যে এল যে, তুমি তাদেরকে বাহন দান করবে, (যাদেরকে) তুমি বললে, 'আমার নিকট তোমাদেরকে আরোহণ করাবার মত কোন বাহন নেই।' তখন তারা এমন অবস্থায় ফিরে গেল যে, তাদের চক্ষু হতে অশ্রু বইতে লাগল এ দুঃখে যে, তাদের কাছে ব্যয় করার মত কোন কিছুই নেই। *(তাওবাহ ঃ ৯২)*

মা আয়েশা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে হজ্জ সফরে ছিলেন। সারেফ নামক জায়গায় এসে তিনি কাঁদতে শুরু করলেন। নবী ﷺ তাঁর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "কী হয়েছে তোমার? কাঁদছ কেন?" আয়েশা বললেন, 'যদি আমি এ বছরে হজ্জে না আসতাম, তাহলে ভাল হত।' তিনি বললেন, "সম্ভবতঃ তোমার মাসিক শুরু হয়েছে?" আয়েশা বললেন, 'জী হ্যাঁ।' তিনি বললেন, "এ তো সেই জিনিস, যা প্রত্যেক

আদম-কন্যার ওপর আল্লাহ অনিবার্য ক'রে দিয়েছেন। সুতরাং হাজীর যাবতীয় কাজ কর। অবশ্য পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তওয়াফ করো না।" *(বুখারী-মুসলিম)*

ইব্রাহীম ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আওফ ؓ কর্তৃক বর্ণিত, একদিন আব্দুর রহমান ইবনে আওফ ؓ-এর কাছে খাবার আনা হল, তখন তাঁর রোযা ছিল। তিনি বললেন, মুসআব ইবনে উমাইর ؓ শহীদ হলেন। আর তিনি ছিলেন আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। (অথচ) তাঁকে কাফন দেওয়ার মত এমন একটি চাদর ভিন্ন অন্য কিছু পাওয়া গেল না, যা দিয়ে তাঁর মাথা ঢাকলে পা দু'টি বের হয়ে যাচ্ছিল এবং পা দু'টি ঢাকলে মাথা বের হয়ে যাচ্ছিল! তারপর আমাদের জন্য পৃথিবীর যে প্রাচুর্য দেওয়া হল, তা হল। অথবা তিনি বললেন, আমাদেরকে পার্থিব সম্পদ যা দেওয়া হল, তা হল। আমাদের আশংকা হয় যে, আমাদের সৎকর্মের (বিনিময়) আমাদের জন্য ত্বরান্বিত করা হয়েছে। অতঃপর তিনি কাঁদতে লাগলেন, এমনকি খাবারও পরিহার করলেন। *(বুখারী)*

আনাস ؓ বলেন, রসূল ﷺ-এর জীবনাবসানের পর আবূ বাক্র সিদ্দীক ؓ উমার ؓ-কে বললেন, 'চলুন, আমরা উম্মে আইমানের সাথে সাক্ষাৎ করতে যাই যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে যেতেন।' সুতরাং যখন তাঁরা উম্মে আইমানের কাছে পৌঁছলেন, তখন তিনি কেঁদে ফেললেন। অতঃপর তাঁরা তাঁকে বললেন, 'তুমি কাঁদছ কেন? তুমি কি জানো না যে, আল্লাহর কাছে যা রয়েছে তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর (দুনিয়া থেকে) অধিক উত্তম?' তিনি উত্তর দিলেন, 'আমি এ জন্য কান্না করছি না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য আল্লাহর নিকট যা রয়েছে, তা অধিকতর উত্তম---সে কথা আমি জানি না। কিন্তু আমি এ জন্য কাঁদছি যে, আসমান হতে ওহী আসা বন্ধ হয়ে গেল।' উম্মে আইমান (তাঁর এ দুঃখজনক কথা দ্বারা) ঐ দু'জনকে কাঁদতে বাধ্য করলেন। ফলে তাঁরাও তাঁর সাথে কাঁদতে লাগলেন। *(মুসলিম)*

শুধু মানুষই নয়, মর্যাদা ক্ষয়ের শোকে গাছও কেঁদে ওঠে! জাবের ؓ হতে

বর্ণিত, তিনি বলেন, একটি খেজুর গাছের গুঁড়ি (খুঁটি) ছিল। নবী ﷺ খুতবাহ দানকালে দাঁড়িয়ে তাতে হেলান দিতেন। তারপর যখন (কাঠের) মিম্বর (তৈরী ক'রে) রাখা হল, তখন আমরা দশ মাসের গাভিন উটনীর শব্দের ন্যায় গুঁড়িটির (কান্নার) শব্দ শুনতে পেলাম। পরিশেষে নবী ﷺ (মিম্বর হতে) নেমে নিজ হাত তার উপর রাখলে সে শান্ত হল।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, যখন জুমআর দিন এল এবং নবী ﷺ মিম্বরের উপর বসলেন, তখন খেজুরের যে গুঁড়ির পাশে তিনি খুতবা দিতেন এমন চিল্লিয়ে কেঁদে উঠল যে, তা ফেটে যাবার উপক্রম হয়ে পড়ল!

অপর বর্ণনায় আছে, শিশুর মত চিল্লিয়ে উঠল। সুতরাং নবী ﷺ (মিম্বর থেকে) নেমে তাকে ধরে নিজ বুকে জড়ালেন। তখন সে সেই শিশুর মত কাঁদতে লাগল, যে শিশুকে (আদর ক'রে) চুপ করানো হয়, (তাকে চুপ করানো হল এবং) পরিশেষে সে প্রকৃতিস্থ হল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "এর কান্নার কারণ হচ্ছে এই যে, এ (কাছে থেকে) খুতবা শুনত (যা থেকে সে এখন বঞ্চিত হয়ে পড়েছে)। *(বুখারী)*

অবশ্য দুঃখ ও বিপদের ক্ষেত্রে শব্দ ক'রে কান্না অথবা অধৈর্য হওয়া উচিত নয়। সান্ত্বনার জন্য তাকে বলা যায় যে, 'তুমি দুঃখ করো না।'

মহানবী ﷺ হিজরতের সঙ্গীকে সওর-গুহায় সে কথা বলেই সান্ত্বনা দিয়েছিলেন।

[إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُواْ السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ] (٤٠) سورة التوبة

অর্থাৎ, যদি তোমরা তাকে (রাসূলুল্লাহকে) সাহায্য না কর, তাহলে আল্লাহই (তাকে সাহায্য করবেন যেমন তিনি) তাকে সাহায্য করেছিলেন সেই সময়ে, যখন অবিশ্বাসীরা তাকে (মক্কা হতে) বহিষ্কার ক'রে দিয়েছিল, যখন সে ছিল দু'জনের মধ্যে একজন; যখন উভয়ে গুহার মধ্যে ছিল। সে তখন স্বীয় সঙ্গী (আবু বাক্র)কে বলেছিল, 'তুমি বিষণ্ণ হয়ো না।

নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন।' অতঃপর আল্লাহ তার প্রতি স্বীয় সান্ত্বনা অবতীর্ণ করলেন এবং এমন সেনাদল দ্বারা তাকে শক্তিশালী করলেন, যাদেরকে তোমরা দেখতে পাওনি এবং তিনি অবিশ্বাসীদের বাক্য নীচু ক'রে দিলেন, আর আল্লাহর বাণীই সমুচ্চ রইলো। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। *(তাওবাহঃ ৪০)*

মহান আল্লাহ নিজ নবীকেও একই কথা বলে সান্ত্বনা দিয়েছেন,

[وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلاَّ بِاللهِّ وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلاَ تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ] (١٢٧) سورة النحل

অর্থাৎ, তুমি ধৈর্যধারণ কর; আর তোমার ধৈর্য তো হবে আল্লাহরই সাহায্যে। তাদের (অবিশ্বাসের) জন্য তুমি দুঃখ করো না এবং তাদের ষড়যন্ত্রে তুমি মনঃক্ষুণ্ণ হয়ো না। *(নাহলঃ ১২৭)*

আর মহানবী ﷺ বলেছেন, "(দেহমনে) সবল মু'মিন আল্লাহর নিকট দুর্বল মু'মিন অপেক্ষা বেশী প্রিয়। আর প্রত্যেকের মধ্যে কল্যাণ রয়েছে। তুমি ঐ জিনিসে যত্নবান হও যাতে তোমার উপকার আছে এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা কর ও উৎসাহহীন হয়ো না। যদি তোমার কিছু ক্ষতি হয় তাহলে এ কথা বলো না যে, 'যদি আমি এ রকম করতাম তাহলে এ রকম হত।' বরং বল, আল্লাহর (লিখিত) ভাগ্য এবং তিনি যা চেয়েছেন তাই করেছেন। কারণ, 'যদি' (শব্দ) শয়তানের কাজের দুয়ার খুলে দেয়।" *(মুসলিম)*

সুতরাং এমন মানুষদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে বলা যায় যে,

'কিসের দুঃখ ভেবো না বন্ধু আসিবে সেদিন পুনো,
এ নিশা তখন আবার তিমিরে ও পারে গিয়াছে শুনো।
আলোক ও ছায়া হাসি ও অশ্রু বিধাতার দু'টি দিক,
কাঙাল কখনো রাজ্য লভিছে রাজায় মাগিছে ভিক।'

পক্ষান্তরে প্রিয়জন বিয়োগের সময় উচ্চ রবে বা মাতম ক'রে কান্না বৈধ নয়। এ ক্ষেত্রেও উচিত ধৈর্যধারণ করা, ধৈর্য ধারণের অসিয়ত করা।

আনাস ﷺ বলেন, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ এক মহিলার পাশ দিয়ে পার হলেন। সে একটি কবরের পাশে বসে কাঁদছিল। তিনি তাকে বললেন, "আল্লাহকে ভয় কর, আর ধৈর্য ধর।" মহিলাটি (যেন রেগে উঠে) বলল, 'সরে যাও আমার কাছ থেকে। আমার যা মুসীবত, তা তোমার কাছে আসেনি!' আসলে মহিলাটি তাঁকে চিনতে পারেনি। পরে কেউ তাকে বলল যে, তিনি আল্লাহর রসূল ﷺ! একথা শুনে তার যেন মরণদশা উপস্থিত হল। মহিলাটি আল্লাহর রসূল ﷺ এর দরজায় এল। দেখল, দরজায় কোন দারোয়ান নেই। তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে সে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি আপনাকে চিনতে পারিনি!' আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "বিপদের প্রথম চোটেই ধৈর্য ধরা হল আসল ধৈর্য।" *(বুখারী, মুসলিম, প্রমুখ)*

মুআয বিন জাবাল ﷺ-কে ইয়ামান প্রেরণ করার সময় মহানবী ﷺ কিছু পথ এগিয়ে দিতে এবং অসিয়ত করতে তাঁর সাথে বের হলেন। মুআয ছিলেন সওয়ারীতে, আর তিনি পায়ে হেঁটে পথ চলছিলেন। অসিয়ত ক'রে অবশেষে তিনি তাঁকে বললেন, "হে মুআয! তুমি হয়তো আগামী বছর আমার দেখা পাবে না। সম্ভবতঃ তুমি আমার মসজিদ ও কবরের পাশ দিয়ে পার হবে!" এ কথা শুনে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সঙ্গহারা হতে হবে জেনে উদ্বিগ্ন হয়ে মুআয কাঁদতে লাগলেন। নবী ﷺ তাঁকে বললেন, "কেঁদো না মুআয! কারণ কান্না হল শয়তানের তরফ থেকে।" *(আহমাদ, ত্বাবারানী, সিঃ সহীহাহ ২৪৯৭নং)*

শোকে-কষ্টে মাতম ক'রে কাঁদা বৈধ নয়। যেহেতু তাতে আল্লাহর তকদীরে অসন্তুষ্টির বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মাতমকারী মহিলা যদি মরণের পূর্বে তাওবাহ না করে, তাহলে আল-কাতরার পায়জামা এবং পাঁচড়ার জামা পরিহিতা অবস্থায় তাকে কিয়ামতের দিনে দাঁড় করানো হবে।" *(মুসলিম)*

তিনি বলেছেন, "মানুষের মধ্যে দুটো আচরণ এমন পাওয়া যায়, যা তাদের ক্ষেত্রে কুফরীমূলক কর্ম; বংশে খোঁটা দেওয়া ও মৃতের জন্য মাতম ক'রে কান্না করা।" *(মুসলিম)*

তিনি বলেছেন, "যখনই কোন মৃত্যুগামী ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করে। আর তার পাশে দাঁড়িয়ে রোদনকারিণী রোদন করে এবং বলে, 'ও আমার পাহাড় গো! ও আমার সর্দার গো!' অথবা অনুরূপ আরো কিছু বলে, তখনই সেই মৃতের জন্য দু'জন ফিরিশ্তা নিযুক্ত করা হয়, যাঁরা তার বুকে ঘুষি মেরে বলতে থাকেন, 'তুই কি ঐ রকম ছিলি নাকি?" *(তিরমিযী)*

নু'মান বিন বাশীর ﷺ বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহাহ ﷺ (একবার) অজ্ঞান হয়ে পড়লে তাঁর বোন কান্না করতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন, 'ও (আমার) পাহাড় গো! ও আমার এই গো! ও আমার ওই গো!' এভাবে তাঁর একাধিক গুণ বর্ণনা করতে লাগলেন। সুতরাং যখন তিনি জ্ঞান ফিরে পেলেন, তখন বললেন, 'তুমি যা কিছু বলেছ, সে সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করা হচ্ছিল যে, তুমি ঐরূপ ছিলে নাকি?' *(বুখারী)*

তিনি বলেছেন, "যার জন্য মাতম করে কান্না করা হয়, তাকে (কবরে বা) কিয়ামতের দিনে তার জন্য মাতম করার দরুন শাস্তি দেওয়া হবে।" *(বুখারী, মুসলিম)*

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সে আমাদের দলভুক্ত নয়, যে (শোকের সময়) গালে আঘাত করে, বুকের কাপড় ছিঁড়ে এবং জাহেলিয়াতের ডাকের ন্যায় ডাক ছাড়ে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

আবূ বুরদাহ বলেন, (তাঁর পিতা) আবূ মূসা আশআরী ﷺ যন্ত্রণায় কাতর হয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। আর (ঐ সময়) তাঁর মাথা তাঁর এক স্ত্রীর কোলে রাখা ছিল এবং সে চিৎকার ক'রে কান্না করতে লাগল। তিনি (অজ্ঞান থাকার কারণে) তাকে বাধা দিতে পারলেন না। সুতরাং যখন তিনি চেতনা ফিরে পেলেন তখন বলে উঠলেন, 'আমি সেই মহিলা থেকে সম্পর্কমুক্ত, যে মহিলা থেকে আল্লাহর রসূল ﷺ সম্পর্কমুক্ত হয়েছেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহর রসূল ﷺ সেই মহিলা থেকে সম্পর্কমুক্ত হয়েছেন, যে শোকে উচ্চ স্বরে মাতম ক'রে কান্না করে, মাথা মুন্ডন করে এবং কাপড় ছিঁড়ে ফেলে।' *(বুখারী ও মুসলিম)*

উম্মে আত্বিআহ নুসাইবাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'বায়আতের সময় নবী ﷺ আমাদের কাছে এই অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন যে, আমরা

মৃত ব্যক্তির জন্য মাতম করব না।' *(বুখারী ও মুসলিম)*

উল্লেখ্য যে, ভয়ে কান্না ও শোকে কান্নার মধ্যে পার্থক্য এই যে, ভয়ের সম্পর্ক ভবিষ্যতের সাথে। আর শোকের সম্পর্ক অতীতের সাথে।

পক্ষান্তরে শোকতাপের কান্না ও খুশীর কান্নার মধ্যে পার্থক্য এই যে, শোকতাপের কান্নার অশ্রু গরম এবং সেই সময় হৃদয় দুঃখিত থাকে। আর খুশীর কান্নার অশ্রু ঠান্ডা এবং সেই সময় হৃদয় উৎফুল্ল থাকে।

৬। দুর্বলতা ও হতাশার কান্না

অনেক মানুষ দুর্বলতায় কান্না করে। কাউকে পেরে না উঠে কান্না করে, কোন কিছুর ব্যাপারে হতাশ হয়ে গেলে কান্না করে। অথচ এমন কান্না বৈধ নয়।

অত্যাচারী স্বামীর কাছে স্ত্রী কষ্ট পেলে, সে জীবনভর দুর্বলদের কান্না কাঁদে।

গলায় মাছের কাঁটা স্বরূপ কোন স্ত্রীর কাছে স্বামী কষ্ট পেলে পুরুষও দুর্বলদের কান্না কাঁদে। আর পুরুষের কান্না বিরল হলেও, সে যখন কাঁদে, তখন রক্তের কান্না কাঁদে।

প্রত্যেক মানুষের জীবনে কান্না আছে, কান্না ছাড়া জীবন হয় না। জীবনের হার আছে, সব সময় মানুষের জিত হয় না। সুতরাং হতাশার অন্ধকারেও মনে আশার বাতি জ্বেলে রেখে পথ চলতে হয়।

মহানবী ﷺ বলেছেন, "......তুমি ঐ জিনিসে যত্নবান হও যাতে তোমার উপকার আছে এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা কর ও উৎসাহহীন হয়ো না। যদি তোমার কিছু ক্ষতি হয় তাহলে এ কথা বলো না যে, 'যদি আমি এ রকম করতাম তাহলে এ রকম হত।' বরং বল, আল্লাহর (লিখিত) ভাগ্য এবং তিনি যা চেয়েছেন তাই করেছেন। কারণ, 'যদি' (শব্দ) শয়তানের কাজের দুয়ার খুলে দেয়।" *(মুসলিম)*

কবির মতো উৎসাহ রেখে বলতে হয়,

'আমি ভয় করব না, ভয় করব না
দু'বেলা মরার আগে মরব না ভাই মরব না।

তরীখানা বাইতে গেলে,
মাঝে মাঝে তুফান মেলে---
তাই বলে হাল ছেড়ে দিয়ে কান্নাকাটি করব না।'

নিজের ভুলে জীবনের স্বপ্ন ভেঙ্গে গেছে, বাঁধা ঘর ভেঙ্গে গেছে, কত নোকসান হয়ে গেছে। যা হয়েছে, তা বয়ে গেছে। তা তো আর ফিরবে না।

'মিছে কান্নায় কী ফল আর,
যাতে না ভোগ পুনঃপুনঃ তারই উপায় কর সার।'

মনের উদ্যম ফিরিয়ে এনে বলতে হবে,

'পথের কাঁটা মানব না নীরবে যাব,
হৃদয়-ব্যথায় কাঁদব না নীরবে যাব।'

৭। লোক-দেখানি কান্না

অনেক লোক আছে, যারা স্বার্থের খাতিরে লোক-দেখানি কান্না কাঁদে। লোককে দেখিয়ে 'হাঁউমাউ' ক'রে কাঁদে ঠিকই, কিন্তু চোখে কোন অশ্রু গড়ায় না। মিছিমিছি চোখ মুছে ঠিকই, কিন্তু রুমালে কোন পানি থাকে না।

এমন কান্না যে মিথ্যা, তা সহজে ধরা পড়ে যায়। আরবী কবি বলেছেন,

إذا اشتبكت دموع في خدود. تبين من بكى ممن تباكى

অর্থাৎ, গালে যখন অশ্রু গড়িয়ে পড়বে, তখনই জানা যাবে, কে সত্যি কাঁদছে, কে মিথ্যা কাঁদছে।

অনেকে মিছা কান্নাও সত্য ক'রেই কাঁদতে পারে। তাদের চোখে পানিও আসে। চোখে কোন কেমিকেল লাগিয়ে নয়, এমনিই ইচ্ছা-শক্তিতে তাদের চোখে পানি আসে!

অনেকের চোখের পানি ঠিক বিষয়ীভুক্ত কান্নার জন্য নয়। তা হয়তো অন্য কোন দুঃখ স্মরণ ক'রে। পরের ছেলের জন্য কাঁদতে গিয়ে নিজের হারানো ছেলের কথা স্মরণ ক'রে কাঁদে।

অনেকে অন্য কিছু কান্নার কারণ স্মরণ ক'রে কাঁদে। যেমন এক হুজুর বক্তৃতা করছিলেন। হঠাৎ ক'রে এক ব্যক্তি কেঁদে উঠল। বক্তা ভাবলেন,

তাঁর বক্তৃতায় বড় প্রভাব পড়েছে। সুতরাং তিনি আরো জোশের সাথে বক্তৃতা করতে করতে বললেন, 'কুরআন-হাদীসের কথা শুনে ঠিক উনার মত প্রভাবিত হতে হবে, তবেই মনের পরিবর্তন আসবে।' কিন্তু লোকটি বলল, 'আমি তো আপনার বক্তৃতা শুনে কাঁদিনি। আমি আপনার দাড়ি হিলানো দেখে কেঁদেছি। আমার একটা বিরাট খাসি ছিল। তার আপনার মতো লম্বা দাড়ি ছিল। সে পাতা খেলে ঐ রকম দাড়ি হিলাতো। সে হঠাৎ ক'রে কোন রোগে মারা গেছে। তাই আপনার দাড়ি হিলিয়ে কথা বলতে দেখে সেই খাসির কথা মনে পড়ে গেলে আমার কান্না এসে গেল!'

এক পাখী শিকারী পাখী ধরে পুড়িয়ে পুড়িয়ে খেতো। তা দেখে পাখীরা উড়ে উড়ে লুকিয়ে বেড়াতো। একবার বরফ-শীতের দিনে পাখী মেরে ঝোলায় রাখছিল। শীতের কারণে তার চোখ থেকে পানি পড়ছিল। এক পাখী অপর পাখীকে বলল, 'লোকটার মনে এবার দয়া হয়েছে। ঐ দেখো ও কাঁদছে। আর বুঝি শিকার করবে না।' অপর পাখীটি বলল, 'ওর চোখের পানি দেখো না, ওর হাতের কাজ দেখো।'

এক ভিখারিণী ভিক্ষা করতে এসেছে এক গৃহিণীর বাড়িতে। গৃহিণী তখন রান্নার প্রস্তুতি নিয়ে কাটাকুটি করছিল। সে ভিক্ষা না দিয়ে জবাব দিল। কিন্তু ভিখারিণী নাছোড় বান্দী। সে নিজে দুরবস্থার কথা বলতে লাগল, 'আমি বিধবা মেয়ে। আমার ঘরে ছোট বাচ্চা। তার আবার অসুখ। দু'দিন থেকে না খাওয়া আছে....।'

কিন্তু গৃহিণী আবারও জবাব দিয়ে বলল, 'বললাম না, অন্য ঘর দেখ।'

ভিখারিণী বলল, 'আমি তো তোমার চোখের পানি দেখে ভাবলাম, আমার দুঃখে তোমার প্রাণ ভিজেছে মা! কিন্তু তুমি জবাব দিয়ে তাড়িয়ে দিচ্ছ।'

গৃহিণী বলল, 'আমার চোখে পানি কি তোমার দুঃখের কাসুন্দি শুনে আসছে? আমি পিঁয়াজ কাটছি বলে আসছে!'

কুমিরের চোখে পানি দেখে এ ধারণা ভুল যে, সে কাঁদছে। কারণ এ পানি তার পানিতে ডুব দেওয়ার সময় চোখে থেকে যাওয়া পানি। এ জন্যই তো

নকল নয়নাশ্রুকে ‘কুম্ভিরাশ্রু’ বলে। আর সাধারণতঃ সে অশ্রু হয় ছলনার। অপরকে ভ্রষ্ট ও প্রতারিত করার জন্য সেই অশ্রু ব্যবহার করা হয়। সাধারণতঃ ছলনাময়ীরা এর সদ্ব্যবহার ক’রে থাকে।

শ্রোতাবৃন্দের মাঝে প্রভাব সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে কোন কোন বক্তা এই শ্রেণীর অশ্রু ব্যবহার ক’রে থাকেন। আসলে তাতে কিন্তু শয়তান হাসে। জ্ঞানীরা বলেছেন, ‘তোমার উপরে ছয় সময়ে শয়তানের হাসি থেকে সাবধান থেকো; রাগের সময়, গর্বের সময়, তর্কের সময়, লোকমুখে তোমার প্রশংসার সময়, বক্তৃতাকালে উত্তেজনার সময় এবং নসীহতকালে কাঁদার সময়।’

এমন কত কান্না হয়, যা কেঁদে মানুষকে ধোঁকা দেওয়া হয়। কত কান্না হয় অভিনয়ের কান্না। আল-কুরআনে বর্ণিত প্রসিদ্ধ কাহিনী ইউসুফ ﷵ-এর কাহিনী। তাতে তার ভাইয়েরা চক্রান্ত ক’রে তাঁকে নিয়ে গিয়ে কুয়াতে ফেলে দিল। তারপর তাঁর জামায় মিথ্যা রক্ত লাগিয়ে দিল।

[وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ (١٦) قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ] (١٧)

তারা রাতে কাঁদতে কাঁদতে তাদের পিতার নিকট এল। তারা বলল, ‘হে আমাদের পিতা! আমরা দৌড়-প্রতিযোগিতা করছিলাম এবং ইউসুফকে আমাদের মালপত্রের নিকট রেখে গিয়েছিলাম, অতঃপর নেকড়ে বাঘ তাকে খেয়ে ফেলেছে; কিন্তু আপনি তো আমাদেরকে বিশ্বাস করবেন না; যদিও আমরা সত্যবাদী।’ *(ইউসুফঃ ১৬-১৭)*

আরবে জাহেলী যুগে কান্নার জন্য ভাড়াটিয়া বিলাপিনী পাওয়া যেত। প্রসিদ্ধির জন্য সেই বিলাপিনী দিয়ে কাঁদিয়ে লোক-সমাজে নাম কুড়ানো যেতো, যেমন বর্তমানে মরাবাড়িতে বিরাট ভোজ ক’রে অথবা মীলাদ অনুষ্ঠান ক’রে নাম কুড়ানো হয়।

এই শ্রেণীর ভাড়াটিয়া বিলাপিনীর জন্য উমার ﷺ বলেছেন, ‘সে নিজের চোখের পানি বিক্রি করে এবং পরের শোকে কাঁদে।’ *(মিনহাজুস সুন্নাহ ৪/৫৫২)*

আমাদের দেশে অবশ্য ভাড়াটিয়া বিলাপিনী পাওয়া যায় না। তবে এমন সুদক্ষ বিলাপিনী আছে, যে এক পাত ভোজের জন্য দূরে-অদূরে অনেক মরাবাড়িতে উপস্থিত হয়ে উক্তরূপ কান্না কাঁদতে পারে। মাতম ক’রে কাঁদতে বড় পারদর্শিনী এই শ্রেণীর মহিলারা। বাঁশ তলাতে বিয়ল গাই, সেই সম্পর্কে মামাতো ভাইয়ের মরা খবর শুনেও কাঁদতে যায় তারা। মাসীর মায়ের বকুল ফুলের বোনপো-বয়ের বোনঝি-জামাই মরার শোকেও হাজির হয়ে মায়াকান্না দেখায় তারা!

কিন্তু ভাড়া করা শোক-বিলাপিনীর কান্না কি বাপ-মা বা স্বামী-হারা মেয়ের কান্নার সমান হয়? কক্ষণই না। যেমন সমান হয় না মা-বাপহারা সন্তানের দুআ ও ভাড়াটিয়া হুজুরের দুআ।

৮। দেখাদেখি কান্না

অনেক লোক আছে, যাদের কান্না দেখে কান্না আসে। কারণ যাই হোক, চোখের পানি দেখলেই তাদের চোখে পানি আসে। যেমন হাসি দেখে অনেকের হাসি আসে, তেমনি কান্নাও।

প্রিয়তম ব্যক্তির কান্নার কারণ না জেনেই তার দুঃখ ও কান্না দেখে নরম মনের মানুষদের কান্না আসা স্বাভাবিক। যেমন সাহাবাগণ ﷺ মহানবী ﷺ-এর কান্না দেখে কাঁদতেন।

৯। আফসোস ও অনুতাপের কান্না

কোন ভুল ক’রে আক্ষেপের ফলে, কোন অপরাধ ক’রে শাস্তি পেয়ে আফসোস ক’রে, কোন পাপ ক’রে অনুতপ্ত হয়ে তওবা ক’রে কান্না ক’রে থাকে অনেক পাপী-তাপী আল্লাহর বান্দা। যেমন সাহাবী কা’ব বিন মালেক কেঁদেছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে যুদ্ধে না যাওয়ার অপরাধে তিনি অপরাধী ছিলেন। মহানবী ﷺ-এর আদেশক্রমে সমাজ তাঁর ও তাঁর সাথীদের সাথে ৫০ দিন বয়কট করেছিল। এমনকি তাঁদের সাথে একটি লোকও কথা পর্যন্ত বলত না, সালাম করলে সালামের জবাবও দিত না।

তাঁদের স্ত্রীদেরকে পর্যন্ত তাঁদের কাছ ঘেঁসতে মানা ক'রে দেওয়া হয়েছিল! আর সেই তাড়নায় তিনি বহু কান্না কেঁদেছিলেন। পরিশেষে তাঁর তওবা কবুল হয়েছিল। বিস্তারিত ঘটনা নিম্নরূপ ঃ-

কা'ব ইবনে মালেকের পুত্র আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত, এই আব্দুল্লাহ কা'ব ﷺ-এর ছেলেদের মধ্যে তাঁর পরিচালক ছিলেন, যখন তিনি অন্ধ হয়ে যান। তিনি (আব্দুল্লাহ) বলেন, আমি (আমার পিতা) কা'ব ইবনে মালেককে ঐ ঘটনা বর্ণনা করতে শুনেছি, যখন তিনি তাবূকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে থেকে যান। তিনি বলেন, 'আমি তাবূক যুদ্ধ ছাড়া যে যুদ্ধই রাসূলুল্লাহ ﷺ করেছেন, তাতে কখনই তাঁর পিছনে থাকিনি। অবশ্য বদরের যুদ্ধ থেকে আমি পিছনে রয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু বদরের যুদ্ধে যে অংশগ্রহণ করেনি, তাকে ভর্ৎসনা করা হয়নি। আসল ব্যাপার ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ ও মুসলিমগণ কুরাইশের কাফেলার পশ্চাদ্ধাবনে বের হয়েছিলেন। (শুরুতে যুদ্ধের নিয়ত ছিল না।) পরিশেষে আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে ও তাঁদের শত্রুকে (পূর্বঘোষিত) মেয়াদ ছাড়াই একত্রিত করেছিলেন। আমি আক্বাবার রাতে (মিনায়) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে উপস্থিত ছিলাম, যখন আমরা ইসলামের উপর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলাম। আক্বাবার রাত অপেক্ষা আমার নিকটে বদরের উপস্থিতি বেশী প্রিয় ছিল না। যদিও বদর (অভিযান) লোক মাঝে ওর চাইতে বেশী প্রসিদ্ধ। (কা'ব বলেন,) আর আমার তাবূকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে থাকার ঘটনা এরূপ যে, এই যুদ্ধ হতে পিছনে থাকার সময় আমি যতটা সমর্থ ও সচ্ছল ছিলাম অন্য কোন সময় ছিলাম না। আল্লাহর কসম! এর পূর্বে আমার নিকট কখনো দু'টি সওয়ারী (বাহন) একত্রিত হয়নি। কিন্তু এই (যুদ্ধের) সময়ে একই সঙ্গে দু'টি সওয়ারী আমার নিকট মওজুদ ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিয়ম ছিল, যখন তিনি কোন যুদ্ধে বের হওয়ার ইচ্ছা করতেন, তখন 'তাওরিয়া' করতেন (অর্থাৎ সফরের গন্তব্যস্থলের নাম গোপন রেখে সাধারণ অন্য স্থানের নাম নিতেন, যাতে শত্রুরা টের না

পায়)। এই যুদ্ধ এইভাবে চলে এল। রাসূলুল্লাহ ﷺ ভীষণ গরমে এই যুদ্ধে বের হলেন এবং দূরবর্তী সফর ও দীর্ঘ মরুভূমির সম্মুখীন হলেন। আর বহু সংখ্যক শত্রুরও সম্মুখীন হলেন। এই জন্য তিনি মুসলমানদের সামনে বিষয়টি স্পষ্ট ক'রে দিলেন; যাতে তাঁরা সেই অনুযায়ী যথোচিত প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। ফলে তিনি সেই দিকও বলে দিলেন, যেদিকে যাবার ইচ্ছা করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে অনেক মুসলমান ছিলেন এবং তাদের কাছে কোন হাজিরা বহি ছিল না, যাতে তাদের নামসমূহ লেখা হবে। এই জন্য যে ব্যক্তি (যুদ্ধে) অনুপস্থিত থাকত, সে এই ধারণাই করত যে, আল্লাহর অহী অবতীর্ণ ছাড়া তার অনুপস্থিতির কথা গুপ্ত থাকবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ এই যুদ্ধ ফল-পাকার মৌসমে করেছিলেন এবং সে সময় (গাছের) ছায়াও উৎকৃষ্ট (ও প্রিয়) ছিল, আর আমার টানও ছিল সেই ফল ও ছায়ার দিকে। সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ ও মুসলমানেরা (যুদ্ধের জন্য) প্রস্তুতি নিলেন। আর (আমার এই অবস্থা ছিল যে,) আমি সকালে আসতাম, যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে আমিও (যুদ্ধের) প্রস্তুতি নিই। কিন্তু কোন ফায়সালা না করেই আমি (বাড়ী) ফিরে আসতাম এবং মনে মনে বলতাম যে, আমি যখনই ইচ্ছা করব, যুদ্ধে শামিল হয়ে যাব। কেননা, আমি এর ক্ষমতা রাখি। আমার এই গড়িমসি অবস্থা অব্যাহত রইল এবং লোকেরা জিহাদের আয়োজনে প্রবৃত্ত থাকলেন।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ ও মুসলমানেরা একদিন সকালে জিহাদে বেরিয়ে পড়লেন এবং আমি প্রস্তুতির ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে পারলাম না। আমি আবার সকালে এলাম এবং বিনা সিদ্ধান্তেই (বাড়ী) ফিরে গেলাম। সুতরাং আমার এই অবস্থা অব্যাহত থেকে গেল। ওদিকে মুসলিম সেনারা দ্রুতগতিতে আগে বাড়তে থাকল এবং যুদ্ধের ব্যাপারও ক্রমশঃ এগুতে লাগল। আমি ইচ্ছা করলাম যে, আমিও সফরে রওয়ানা হয়ে তাদের সঙ্গ পেয়ে নিই। হায়! যদি আমি তাই করতাম (তাহলে কতই না ভাল হত)। কিন্তু এটা আমার ভাগ্যে হয়ে উঠল না।

এদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চলে যাওয়ার পর যখনই আমি লোকের মাঝে আসতাম, তখন এ জন্যই দুঃখিত ও চিন্তিত হতাম যে, এখন (মদীনায়) আমার সামনে কোন আদর্শ আছে তো কেবলমাত্র মুনাফিক কিংবা এত দুর্বল ব্যক্তিরা, যাদেরকে আল্লাহ ক্ষমার্হ বা অপারগ বলে গণ্য করেছেন।

সম্পূর্ণ রাস্তা রসূল ﷺ আমাকে স্মরণ করলেন না। তাবূক পৌঁছে যখন তিনি লোকের মাঝে বসেছিলেন, তখন আমাকে স্মরণ করলেন এবং বললেন, "কা'ব বিন মালেকের কী হয়েছে?" বানু সালেমাহ (গোত্রের) একটি লোক বলে উঠল, "হে আল্লাহর রসূল! তার দুই চাদর এবং দুই পার্শ্ব দর্শন (অর্থাৎ ধন ও তার অহঙ্কার) তাকে আটকে দিয়েছে।" (এ কথা শুনে) মুআয বিন জাবাল ﷺ বললেন, "বাজে কথা বললে তুমি। আল্লাহর কসম, হে আল্লাহর রসূল! আমরা তার ব্যাপারে ভাল ছাড়া অন্য কিছু জানি না।" রসূল ﷺ নীরব থাকলেন।

এসব কথাবার্তা চলছিল এমতাবস্থায় তিনি একটি লোককে সাদা পোশাক পরে (মরুভূমির) মরীচিকা ভেদ ক'রে আসতে দেখলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তুমি যেন আবূ খাইসামাহ হও।" (দেখা গেল,) সত্যিকারে তিনি আবূ খাইসামাহ আনসারীই ছিলেন। আর তিনি সেই ব্যক্তি ছিলেন, যিনি একবার আড়াই কিলো খেজুর সদকাহ করেছিলেন বলে মুনাফিকরা (তা অল্প মনে করে) তাঁকে বিদ্রূপ করেছিল।'

কা'ব বলেন, 'অতঃপর যখন আমি সংবাদ পেলাম যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাবূক থেকে ফিরার সফর শুরু ক'রে দিয়েছেন, তখন আমার মনে কঠিন দুশ্চিন্তা এসে উপস্থিত হল এবং মিথ্যা অজুহাত পেশ করার চিন্তা করতে লাগলাম এবং মনে মনে বলতে লাগলাম যে, আগামী কাল যখন রসূল ﷺ ফিরবেন, সে সময় আমি তাঁর রোষানল থেকে বাঁচব কী উপায়ে? আর এ ব্যাপারে আমি পরিবারের প্রত্যেক বুদ্ধিমান মানুষের সহযোগিতা চাইতে লাগলাম। অতঃপর যখন বলা হল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আগমন একদম নিকটবর্তী, তখন আমার অন্তর থেকে বাতিল (পরিকল্পনা) দূর হয়ে গেল।

এমনকি আমি বুঝতে পারলাম যে, মিথ্যা বলে আমি কখনই বাঁচতে পারব না। সুতরাং আমি সত্য বলার দৃঢ় সঙ্কল্প ক'রে নিলাম। এদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ সকালে (মদীনায়) পদার্পণ করলেন। তাঁর অভ্যাস ছিল, যখন তিনি সফর থেকে (বাড়ি) ফিরতেন, তখন সর্বপ্রথম মসজিদে দু' রাকআত নামায পড়তেন। তারপর (সফরের বিশেষ বিশেষ খবর শোনাবার জন্য) লোকেদের জন্য বসতেন। সুতরাং এই সফর থেকে ফিরেও যখন পূর্ববৎ কাজ করলেন, তখন মুনাফেকরা এসে তাঁর নিকট ওজর-আপত্তি পেশ করতে লাগল এবং কসম খেতে আরম্ভ করল। এরা সংখ্যায় আশি জনের কিছু বেশী ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের বাহ্যিক ওজর গ্রহণ করে নিলেন, তাদের বায়আত নিলেন, তাদের জন্য (আল্লাহর কাছে) ক্ষমা প্রার্থনা করলেন এবং তাদের গোপনীয় অবস্থা আল্লাহকে সঁপে দিলেন। অবশেষে আমিও তাঁর খিদমতে হাজির হলাম। অতঃপর যখন আমি তাঁকে সালাম দিলাম, তখন তিনি রাগান্বিত ব্যক্তির হাসির মত মুচকি হাসলেন। অতঃপর তিনি বললেন, "সামনে এসো!" আমি তাঁর সামনে এসে বসে পড়লাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কেন জিহাদ থেকে পিছনে রয়ে গেলে? তুমি কি বাহন ক্রয় করনি?" আমি বললাম, "হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর কসম! আমি যদি আপনি ছাড়া দুনিয়ার অন্য কোন লোকের কাছে বসতাম, তাহলে নিশ্চিতভাবে কোন মিথ্যা ওজর পেশ করে তার অসন্তুষ্টি থেকে বেঁচে যেতাম। বাক্চাতুর্য (বা তর্ক-বিতর্ক করা)র অভিজ্ঞতা আমার যথেষ্ট রয়েছে। কিন্তু আল্লাহর কসম! আমি জানি যে, যদি আজ আপনার সামনে মিথ্যা বলি, যাতে আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন, তাহলে অতি সত্বর আল্লাহ তা'আলা (অহী দ্বারা সংবাদ দিয়ে) আপনাকে আমার উপর অসন্তুষ্ট ক'রে দেবেন। পক্ষান্তরে আমি যদি আপনাকে সত্য কথা বলি, তাহলে আপনি আমার উপর অসন্তুষ্ট হবেন। কিন্তু আমি আল্লাহর নিকট এর সুফলের আশা রাখি। (সেহেতু আমি সত্য কথা বলছি যে,) আল্লাহর কসম! (আপনার সাথে জিহাদে যাওয়ার

ব্যাপারে) আমার কোন অসুবিধা ছিল না। আল্লাহর কসম! আপনার সাথ ছেড়ে পিছনে থাকার সময় আমি যতটা সমর্থ ও সচ্ছল ছিলাম ততটা কখনো ছিলাম না।” রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, “এই লোকটি নিশ্চিতভাবে সত্য কথা বলেছে। বেশ, তুমি এখান থেকে চলে যাও, যে পর্যন্ত তোমার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা কোন ফায়সালা না করবেন।”

আমার পিছনে পিছনে বনু সালেমাহ (গোত্রের) কিছু লোক এল এবং আমাকে বলল যে, “আল্লাহর কসম! আমরা অবগত নই যে, তুমি এর পূর্বে কোন পাপ করেছ। অন্যান্য পিছনে থেকে যাওয়া লোকেদের ওজর পেশ করার মত তুমিও কোন ওজর পেশ করলে না কেন? তোমার পাপ মোচনের জন্য এটাই যথেষ্ট ছিল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমার জন্য (আল্লাহর নিকট) ক্ষমা প্রার্থনা করতেন।” কা’ব বলেন, ‘আল্লাহর কসম! লোকেরা আমাকে আমার সত্য কথা বলার জন্য তিরস্কার করতে থাকল। পরিশেষে আমার ইচ্ছা হল যে, আমি দ্বিতীয়বার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গিয়ে প্রথম কথা অস্বীকার করি (এবং কোন মিথ্যা ওজর পেশ ক’রে দিই।) আবার আমি তাদেরকে বললাম, “আমার এ ঘটনা কি অন্য কারো সাথে ঘটেছে?” তাঁরা বললেন, “হ্যাঁ। তোমার মত আরো দু’জন সমস্যায় পড়েছে। (রসূল ﷺ-এর নিকটে) তারাও সেই কথা বলেছে, যা তুমি বলেছ এবং তাদেরকে সেই কথাই বলা হয়েছে, যা তোমাকে বলা হয়েছে।” আমি তাদেরকে বললাম, “তারা দু’জন কে?” তারা বলল, “মুরারাহ ইবনে রাবী’ আম্‌রী ও হিলাল ইবনে উমাইয়্যাহ ওয়াক্বেফী।” এই দু’জন যাঁদের কথা তারা আমার কাছে বর্ণনা করল, তাঁরা সৎলোক ছিলেন এবং বদর যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন; তাঁদের মধ্যে আমার জন্য আদর্শ ছিল। যখন তারা সে দু’জন ব্যক্তির কথা বলল, তখন আমি আমার পূর্বেকার অবস্থার (সত্যের) উপর অনড় থেকে গেলাম (এবং আমার কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা দূরীভূত হল। যাতে আমি তাদের ভর্ৎসনার কারণে পতিত হয়েছিলাম)। (এরপর) রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদেরকে পিছনে

অবস্থানকারীদের মধ্যে আমাদের তিনজনের সাথে কথাবার্তা বলতে নিষেধ ক’রে দিলেন।’

কা’ব ؓ বলেন, ‘লোকেরা আমাদের থেকে পৃথক হয়ে গেল।’ অথবা বললেন, ‘লোকেরা আমাদের জন্য পরিবর্তন হয়ে গেল। পরিশেষে পৃথিবী আমার জন্য আমার অন্তরে অপরিচিত মনে হতে লাগল। যেন এটা সেই পৃথিবী নয়, যা আমার পরিচিত ছিল। এইভাবে আমরা ৫০টি রাত কাটালাম। আমার দুই সাথীরা তো নরম হয়ে ঘরের মধ্যে কান্নাকাটি আরম্ভ ক’রে দিলেন। কিন্তু আমি দলের মধ্যে সবচেয়ে যুবক ও বলিষ্ঠ ছিলাম। ফলে আমি ঘর থেকে বের হয়ে মুসলমানদের সাথে নামাযে হাজির হতাম এবং বাজারসমূহে ঘোরাফেরা করতাম। কিন্তু কেউ আমার সঙ্গে কথা বলত না। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে হাজির হতাম এবং তিনি যখন নামাযের পর বসতেন, তখন তাঁকে সালাম দিতাম, আর আমি মনে মনে বলতাম যে, তিনি আমার সালামের জওয়াবে ঠোঁট নড়াচ্ছেন কি না? তারপর আমি তাঁর নিকটেই নামায পড়তাম এবং আড়চোখে তাঁকে দেখতাম। (দেখতাম,) যখন আমি নামাযে মনোযোগী হচ্ছি, তখন তিনি আমার দিকে তাকাচ্ছেন এবং যখন আমি তাঁর দিকে দৃষ্টি ফিরাচ্ছি, তখন তিনি আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন!

অবশেষে যখন আমার সাথে মুসলিমদের বিমুখতা দীর্ঘ হয়ে গেল, তখন একদিন আমি আবূ ক্বাতাদাহ ؓ-এর বাগানে দেওয়াল ডিঙিয়ে (তাতে প্রবেশ করলাম।) সে (আবূ ক্বাতাদাহ) আমার চাচাতো ভাই এবং আমার সর্বাধিক প্রিয় লোক ছিল। আমি তাকে সালাম দিলাম। কিন্তু আল্লাহর কসম! সে আমার সালামের জওয়াব দিল না। আমি তাকে বললাম, “হে আবূ ক্বাতাদাহ! আমি তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, তুমি কি জান যে, আমি আল্লাহ এবং তাঁর রসূল ﷺ-কে ভালবাসি?” সে নিরুত্তর থাকল। আমি দ্বিতীয়বার কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। এবারেও সে চুপ থাকল। আমি তৃতীয়বার কসম দিয়ে প্রশ্নের

পুনরাবৃত্তি করলে সে বলল, “আল্লাহ ও তাঁর রসূলই বেশী জানেন।” এ কথা শুনে আমার চক্ষুদ্বয় থেকে অশ্রু বইতে লাগল এবং যেভাবে গিয়েছিলাম, আমি সেইভাবেই দেওয়াল ডিঙিয়ে ফিরে এলাম।

এরই মধ্যে একদিন মদীনার বাজারে হাঁটছিলাম। এমন সময় শাম দেশের কৃষকদের মধ্যে একজন কৃষককে---যে মদীনায় খাদ্যদ্রব্য বিক্রি করতে এসেছিল---বলতে শুনলাম, কে আমাকে কা'ব বিন মালেককে দেখিয়ে দেবে? লোকেরা আমার দিকে ইঙ্গিত করতে লাগল। ফলে সে ব্যক্তি আমার নিকটে এসে আমাকে 'গাস্সান'-এর বাদশার একখানি পত্র দিল। আমি লিখা-পড়া জানতাম, তাই আমি পত্রখানি পড়লাম। পত্রে লিখা ছিল, '--- অতঃপর আমরা এই সংবাদ পেয়েছি যে, আপনার সঙ্গী (মুহাম্মাদ) আপনার প্রতি দুর্ব্যবহার করেছে। আল্লাহ আপনাকে লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত অবস্থায় থাকার জন্য সৃষ্টি করেননি। আপনি আমাদের কাছে চলে আসুন; আমরা আপনার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করব।'

পত্র পড়ে আমি বললাম, 'এটাও অন্য এক বালা (পরীক্ষা)।' সুতরাং আমি ওটাকে চুলোয় ফেলে জ্বালিয়ে দিলাম। অতঃপর যখন ৫০ দিনের মধ্যে ৪০ দিন গত হয়ে গেল এবং অহী আসা বন্ধ ছিল---এই অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একজন দূত আমার নিকট এসে বলল, “রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাকে তোমার স্ত্রী থেকে পৃথক থাকার আদেশ দিচ্ছেন!” আমি জিজ্ঞাসা করলাম, “আমি কি তাকে তালাক দেব, না কি করব?” সে বলল, “তালাক নয় বরং তার নিকট থেকে আলাদা থাকবে, মোটেই ওর নিকটবর্তী হবে না।” আমার দুই সাথীর নিকটেও এই বার্তা পৌঁছে দিলেন। আমি আমার স্ত্রীকে বললাম, “তুমি পিত্রালয়ে চলে যাও এবং সেখানে অবস্থান কর---যে পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা এ ব্যাপারে কোন ফায়সালা না করেন।” (আমার সাথীদ্বয়ের মধ্যে একজন সাথী) হিলাল বিন উমাইয়ার স্ত্রী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, “ইয়া রাসূলাল্লাহ! হিলাল বিন উমাইয়াহ খুবই বৃদ্ধ মানুষ, তার কোন খাদেমও নেই, সেহেতু আমি যদি

তার খিদমত করি, তবে আপনি কি এটা অপছন্দ করবেন?” তিনি বললেন, “না, (অর্থাৎ তুমি তার খিদমত করতে পার।) কিন্তু সে যেন তোমার (মিলন উদ্দেশ্যে) নিকটবর্তী না হয়।” (হিলালের স্ত্রী) বলল, “আল্লাহর কসম! (দুঃখের কারণে এ ব্যাপারে) তার কোন সক্রিয়তা নেই। আল্লাহর কসম! যখন থেকে এ ব্যাপার ঘটেছে, তখন থেকে আজ পর্যন্ত সে সর্বদা কাঁদছে।”

(কা'ব বলেন,) 'আমাকে আমার পরিবারের কিছু লোক বলল যে, “তুমিও যদি নিজ স্ত্রীর ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট অনুমতি চাইতে, (তাহলে তা তোমার পক্ষে ভাল হত।) তিনি হিলাল বিন উমাইয়ার স্ত্রীকে তো তার খিদমত করার অনুমতি দিয়ে দিয়েছেন।” আমি বললাম, “এ ব্যাপারে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট অনুমতি চাইব না। জানি না, যখন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটে অনুমতি চাইব, তখন তিনি কী বলবেন। কারণ, আমি তো যুবক মানুষ।”

এভাবে আরও দশদিন কেটে গেল। যখন থেকে লোকদেরকে আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে নিষেধ করা হয়েছে, তখন থেকে এ পর্যন্ত আমাদের পঞ্চাশ রাত পূর্ণ হয়ে গেল। আমি পঞ্চাশতম রাতে আমাদের এক ঘরের ছাদের উপর ফজরের নামায পড়লাম। নামায পড়ার পর আমি এমন অবস্থায় বসে আছি যার বর্ণনা আল্লাহ তাআলা আমাদের ব্যাপারে দিয়েছেন---আমার জীবন আমার জন্য দুর্বিষহ হয়ে পড়েছিল এবং পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও আমার প্রতি সংকীর্ণ হয়ে উঠেছিল---এমন সময় আমি এক চিৎকারকারীর আওয়াজ শুনতে পেলাম, সে সালআ পাহাড়ের উপর চড়ে উচ্চৈঃস্বরে বলছে, “হে কা'ব ইবনে মালেক! তুমি সুসংবাদ নাও!” আমি তখন (খুশীতে শুকরিয়ার) সিজদায় পড়ে গেলাম এবং বুঝতে পারলাম যে, (আল্লাহর পক্ষ থেকে) মুক্তি এসেছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের নামায পড়ার পর লোকদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, আল্লাহ আয্যা অজাল্ল্ আমাদের তওবা কবূল ক'রে

নিয়েছেন। সুতরাং লোকেরা আমাদেরকে সুসংবাদ দেওয়ার জন্য আসতে আরম্ভ করল। এক ব্যক্তি আমার দিকে অতি দ্রুত গতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে এল। সে ছিল আসলাম (গোত্রের) এক ব্যক্তি। আমার দিকে সে দৌড়ে এল এবং পাহাড়ের উপর চড়ে (আওয়াজ দিল)। তার আওয়াজ ঘোড়ার চেয়েও দ্রুতগামী ছিল। সুতরাং যখন সে আমার কাছে এল, যার সুসংবাদের আওয়াজ আমি শুনেছিলাম, তখন আমি তার সুসংবাদ দানের বিনিময়ে আমার দেহ থেকে দু'খানি বস্ত্র খুলে তাকে পরিয়ে দিলাম। আল্লাহর কসম! সে সময় আমার কাছে এ দু'টি ছাড়া আর কিছু ছিল না। আর আমি নিজে দু'খানি কাপড় অস্থায়ীভাবে ধার নিয়ে পরিধান করলাম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। পথে লোকেরা দলে দলে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে আমাকে মুবারকবাদ জানাতে লাগল এবং বলতে লাগল, "আল্লাহ তাআলা তোমার তওবা কবুল করেছেন, তাই তোমাকে ধন্যবাদ।" অতঃপর আমি মসজিদে প্রবেশ করলাম। (দেখলাম,) রাসূলুল্লাহ ﷺ বসে আছেন এবং তাঁর চারিপাশে লোকজন আছে। ত্বালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ رضي الله عنه উঠে ছুটে এসে আমার সঙ্গে মুসাফাহা করলেন এবং আমাকে মুবারকবাদ দিলেন। আল্লাহর কসম! মুহাজিরদের মধ্যে তিনি ছাড়া আর কেউ উঠলেন না।' সুতরাং কা'ব ত্বালহা رضي الله عنه-এর এই ব্যবহার কখনো ভুলতেন না। কা'ব বলেন, 'যখন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সালাম জানালাম, তখন তিনি তাঁর খুশীময় উজ্জ্বল চেহারা নিয়ে আমাকে বললেন, "তোমার মা তোমাকে যখন প্রসব করেছে, তখন থেকে তোমার জীবনের বিগত সর্বাধিক শুভদিনের তুমি সুসংবাদ নাও!" আমি বললাম, "হে আল্লাহর রসূল! এই শুভসংবাদ আপনার পক্ষ থেকে, না কি আল্লাহর পক্ষ থেকে?" তিনি বললেন, "না, বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে।"

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন খুশি হতেন, তখন তাঁর চেহারা উজ্জ্বল হয়ে যেত, মনে হত যেন তা একফালি চাঁদ এবং এতে আমরা তাঁর এ (খুশী হওয়ার)

কথা বুঝতে পারতাম। অতঃপর যখন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে বসলাম, তখন আমি বললাম, "হে আল্লাহর রসূল! আমার তওবা কবুল হওয়ার দরুন আমি আমার সমস্ত মাল আল্লাহ ও তাঁর রসুলের রাস্তায় সাদকাহ ক'রে দিচ্ছি।" তিনি বললেন, "তুমি কিছু মাল নিজের জন্য রাখ, তোমার জন্য তা উত্তম হবে।" আমি বললাম, "যাই হোক! আমি আমার খায়বারের (প্রাপ্ত) অংশ রেখে নিচ্ছি।" আর আমি এ কথাও বললাম যে, "হে আল্লাহর রসূল! নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা আমাকে সত্যবাদিতার কারণে (এই বিপদ থেকে) উদ্ধার করলেন। আর এটাও আমার তওবার দাবী যে, যতদিন আমি বেঁচে থাকব, সর্বদা সত্য কথাই বলব।" সুতরাং আল্লাহর কসম! যখন থেকে আমি রসূল ﷺ-এর সঙ্গে সত্য কথা বলার প্রতিজ্ঞা করলাম---আমি জানি না যে, আল্লাহ তাআলা কোন মুসলমানকে সত্য কথার বলার প্রতিদান স্বরূপ উৎকৃষ্ট পুরস্কার দিয়েছেন। আল্লাহর কসম! আমি যেদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এ কথা বলেছি, সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত আমি মিথ্যা কথা বলার ইচ্ছা করিনি। আর আশা করি যে, বাকী জীবনেও আল্লাহ তাআলা আমাকে এ থেকে নিরাপদ রাখবেন।'

কা'ব বলেন, 'আল্লাহ তাআলা (আমাদের ব্যাপারে আয়াত) অবতীর্ণ করেছেন, (যার অর্থ), "আল্লাহ ক্ষমা করলেন নবীকে এবং মুহাজির ও আনসারদেরকে যারা সংকট মুহূর্তে নবীর অনুগামী হয়েছিল, এমন কি যখন তাদের মধ্যকার এক দলের অন্তর বাঁকা হওয়ার উপক্রম হয়েছিল, তারপর আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করলেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদের প্রতি বড় স্নেহশীল, পরম করুণাময়। আর ঐ তিন ব্যক্তিকেও ক্ষমা করলেন, যাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ স্থগিত রাখা হয়েছিল; পরিশেষে পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তাদের প্রতি সংকীর্ণ হয়ে উঠেছিল এবং তাদের জীবন তাদের জন্য দুর্বিষহ হয়ে পড়েছিল আর তারা উপলব্ধি করেছিল যে, আল্লাহ ছাড়া আল্লাহর পাকড়াও হতে বাঁচার অন্য কোন আশ্রয়স্থল নেই। পরে তিনি তাদের প্রতি অনুগ্রহপরায়ণ হলেন, যাতে

তারা তওবা করে। নিশ্চয় আল্লাহই হচ্ছেন তওবা গ্রহণকারী, পরম করুণাময়। হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সঙ্গী হও।” *(সূরাহ তাওবাহ ১১৭-১১৯ আয়াত)*

কা’ব বিন মালেক বলেন, ‘আল্লাহ আমাকে ইসলামের জন্য হিদায়াত করার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সত্য কথা বলা অপেক্ষা বড় পুরস্কার আমার জীবনে আল্লাহ আমাকে দান করেননি। ভাগ্যে আমি তাঁকে মিথ্যা কথা বলিনি। নচেৎ তাদের মতো আমিও ধ্বংস হয়ে যেতাম, যারা মিথ্যা বলেছিল। আল্লাহ তাআলা যখন অহী অবতীর্ণ করলেন, তখন নিকৃষ্টভাবে মিথ্যুকদের নিন্দা করলেন। সুতরাং আল্লাহ তাআলা তাদের ব্যাপারে বললেন, “যখন তোমরা তাদের কাছে ফিরে যাবে, তারা তখন অচিরেই তোমাদের সামনে শপথ ক’রে বলবে, যেন তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা কর; অতএব তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা কর; তারা হচ্ছে অতিশয় ঘৃণ্য, আর তাদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম, তা হল তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল। তারা এ জন্য শপথ করবে, যেন তোমরা তাদের প্রতি রাজী হয়ে যাও, অনন্তর যদি তোমরা তাদের প্রতি রাজী হয়ে যাও, তবে আল্লাহ তো এমন দুষ্কর্মকারী লোকদের প্রতি রাজী হবেন না।” *(ঐ ৯৫-৯৬ আয়াত, বুখারী-মুসলিম)*

গোনাহ ক’রে লজ্জিত হয়ে অনুতাপের কান্না কাঁদা অবশ্যই উত্তম। উক্ববাহ বিন আমের ﷺ বলেন, আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর রসূল! পরিত্রাণের উপায় কী?’ তিনি বললেন, “তুমি তোমার জিহ্বাকে নিজের আয়ত্তাধীন কর, স্বগৃহে অবস্থান কর, আর তোমার পাপের উপর (আল্লাহর নিকট) রোদন কর।” *(সহীহ তিরমিযী ১৯৬১ নং)*

১০। আল্লাহর ভয়ে কান্না

আল্লাহর ভয়ে কান্না ঃ-

মৃত্যু ও হিসাবের ভয়ে কান্না, যেহেতু মরণের পর আল্লাহ হিসাব নেবেন।
কবরের ভয়ে কান্না, যেহেতু আল্লাহ কবরে বান্দার হিসাব নেবেন।
জাহান্নামের ভয়ে কান্না, যেহেতু জাহান্নামে পাপের প্রতিফল ভুগতে হবে।

** আল্লাহর ভয়ে কান্নায় চোখের শুকরিয়া আদায় হয়।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শুকরিয়া হল, তার দ্বারা কোন পাপ না করা। চোখও একটি বড় নিয়ামত। তার শুকরিয়া হল আল্লাহর ভয়ে কান্না করা।

আর এ কথা বিদিত যে, নিয়ামতের শুকরিয়া করলে নিয়ামতের ঋদ্ধি-বৃদ্ধি হয়, এটা আল্লাহর ওয়াদা।

অতএব বান্দার উচিত, একান্তে তাঁর দেওয়া কত নিয়ামতের কথা স্মরণ ক’রে মনে মনে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ক’রে চোখের পানি বহানো। নিজ নিজ প্রাপ্ত নিয়ামতের কথা স্মরণ ক’রে তাঁর কৃতজ্ঞতা স্বীকার ক’রে কান্না করা।

হে আমার প্রতিপালক! কষ্টের পর স্বস্তি দিয়েছ তুমি, তোমার কৃতজ্ঞতার কি শেষ আছে?

‘ছেঁড়া কাঁথায় ঘুম দিয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন’ দেখতাম, সে স্বপ্ন বাস্তব ক’রে দিয়েছ তুমি। তোমার প্রতি কি ভক্তি না জাগে?

কুঁড়ে ঘর থেকে তুলে এনে বালাখানার বাসিন্দা করেছ আমাকে। তোমার কথা কি ভুলতে পারি?

দারিদ্রের সাথে লড়াই করতে করতে বেঁচেছি, আজ রাজা বানিয়ে দিয়েছ আমাকে। তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতায় কি চোখে পানি না আসে?

‘দয়া বলে, কে গো তুমি মুখে নাই কথা?
অশ্রু ভরা আঁখি বলে, আমি কৃতজ্ঞতা।’

লাঞ্ছনার লাথি-জুতা খেতে খেতে ঘুরেছি, আজ সম্মানের উচ্চ আসনে স্থান দিয়েছ আমাকে। তোমার প্রতি কি অনুরাগ না আসে?

অনেক কিছু দিয়েছ আমাকে, আবার অনেক কিছু থেকেই বঞ্চিত রেখেছ। সবাইকে তুমি সব জিনিস দাও না। সবাই তো আর সব চাওয়া পায় না। সেই বঞ্চনার বুকে কি কান্না-বাষ্প চেপে রাখা যায়?

‘মরমে লুকানো কত দুখ ঢাকিয়া রয়েছি ম্লানমুখ,
কাঁদিবার নাই অবসর কথা নাই শুধু ফাটে বুক।’

মাড়ে-ভাতে খেত যে, সে বিরিয়ানী-পোলাও খেতে বসে শুকরিয়ার কান্না কাঁদে, গরীব হয়ে নবীর দেশে পৌঁছে মক্কা-মদীনায় বসে কৃতজ্ঞতার কান্না কাঁদে।

চাওয়া-পাওয়ার সমন্বয়ে শুকরিয়ার কান্না বড় করুণ, বড় মর্মান্তিক! স্মৃতিচারণা করলে প্রীতি বাড়ে, আকাঙ্ক্ষা বাড়ে। আর তাতেই কান্না আসে।

** আল্লাহর ভয়ে কান্না মনের ময়লা সাফ ক'রে দেয়।

চোখের পানিতে মন ধোয়, চোখ ধোয়। মনের মলিনতা দূর হয়। যে আল্লাহর ভয়ে কাঁদতে পারে, তার মনে কি আর কোন কালিমা থাকে? কক্ষনো না।

** আল্লাহর ভয়ে কান্না হৃদয়কে নরম ক'রে দেয়।

অবশ্যই। নরম না হলে কান্না আসবে কেন? কোন পাষাণ মনের মানুষের চোখ থেকে তো পানি আসতে পারে না। যে আল্লাহর ভয়ে কাঁদতে জানে, সে সৃষ্টির প্রতি সদয় হয়ে কাঁদতে পারে। আর যে পৃথিবীবাসীর প্রতি দয়া প্রদর্শন করে, তার প্রতি আকাশ-ওয়ালা দয়া করেন।

** আল্লাহর ভয়ে কান্না আল্লাহর খাস বান্দাগণের আচরণ।

অবশ্যই যাঁদের কাছে আল্লাহর মারিফাত আছে, যাঁরা আল্লাহকে যথাযথভাবে চেনেন, তাঁরা তাঁর ভয়ে কান্না করবেন। মহান আল্লাহর কথা শুনে, তাঁর আয়াত পাঠ ক'রে অথবা শুনে তাঁদের চোখ অশ্রুসিক্ত হবে। মহান আল্লাহ আল-কুরআনে তাঁদের প্রশংসা করেছেন,

[أُوْلَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَن خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا]

(٥٨) سورة مريم

অর্থাৎ, নবীদের মধ্যে যাদেরকে আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন এরাই তারা, আদমের ও যাদেরকে আমি নূহের সাথে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম তাদের বংশোদ্ভূত, ইব্রাহীম ও ইস্রাঈলের বংশোদ্ভূত ও যাদেরকে আমি পথ নির্দেশ করেছিলাম ও মনোনীত করেছিলাম তাদের অন্তর্ভুক্ত। তাদের

নিকট পরম করুণাময়ের আয়াত আবৃত্তি করা হলে তারা ক্রন্দন করতে করতে সিজদায় লুটিয়ে পড়ত। *(মারয়্যাম ঃ ৫৮)*

তাঁরা সেই সর্বগুণাধার মহান আল্লাহর নিকট বিনয় প্রকাশ ক'রে, তাঁর শক্তির কাছে দুর্বলতা স্বীকার ক'রে, তাঁর অমুখাপেক্ষিতার কাছে মুখাপেক্ষিতা প্রকাশ ক'রে, তাঁর দেওয়া অসংখ্য নিয়ামতের শুকরিয়া ক'রে, তাঁর শতমুখী দানের প্রশংসা ক'রে সিজদাবনত হয়ে কান্না করেন।

যাঁদের নিকট ইল্ম আছে, ইসলামী আক্বীদা ও আহকামের ইল্ম আছে, যাঁরা আলেম, তাঁরাই আল্লাহকে ভয় করেন। মহান আল্লাহ এ কথা বলেছেন,

[إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء] (٢٨) سورة فاطر

অর্থাৎ, আল্লাহর দাসদের মধ্যে জ্ঞানীরাই তাঁকে ভয় ক'রে থাকে। *(ফাত্বির ঃ ২৮)*

আর যাঁরা আলেম, তাঁরাই তাঁর ভয়ে সিজদায় পড়ে বড় বিনয়ের সাথে কান্না করেন। তিনি তাঁদের প্রশংসা ক'রে বলেন,

[قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ سُجَّداً (١٠٧) وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولاً (١٠٨) وَيَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا] (١٠٩) الإسراء

অর্থাৎ, তুমি বল, 'তোমরা কুরআনে বিশ্বাস কর অথবা না কর, যাদেরকে এর পূর্বে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তাদের নিকট যখন এটা পাঠ করা হয়, তখনই তারা চেহারা লুটিয়ে সিজদায় পড়ে এবং বলে, আমাদের প্রতিপালক পবিত্র, মহান! অবশ্যই আমাদের প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি কার্যকর হয়েই থাকে। আর তারা কাঁদতে কাঁদতে ভূমিতে লুটিয়ে (সিজদা) দেয় এবং এ (কুরআন) তাদের বিনয় বৃদ্ধি করে।' *(বানী ইস্রাঈল ঃ ১০৭-১০৯)*

[وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ] (٨٣) سورة المائدة

অর্থাৎ, যখন তারা রসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা শ্রবণ করে, তখন তারা যে সত্য উপলব্ধি করে, তার জন্য তুমি তাদের চক্ষু অশ্রুবিগলিত দেখবে। তারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা বিশ্বাস করেছি। অতএব তুমি আমাদের (সত্যের) সাক্ষীদের দলভুক্ত কর। *(মাইদাহ ঃ ৮৩)*

যে মুমিনগণ আল্লাহর কালাম বুঝেন, তাঁরা অবশ্যই তাঁর আয়াত পড়ে ভয় পান।

[اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاء وَمَن يُضْلِلْ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ] (٢٣) سورة الزمر

অর্থাৎ, আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন উত্তম বাণী সম্বলিত এমন এক গ্রন্থ, যাতে পারস্পরিক সাদৃশ্যপূর্ণ একই কথা নানাভাবে বার বার বলা হয়েছে। এতে যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, তাদের চামড়ার (লোম) খাড়া হয়, অতঃপর তাদের দেহ-মন আল্লাহর স্মরণের প্রতি নরম হয়ে যায়। এটিই আল্লাহর পথনির্দেশ, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দিয়ে পথপ্রদর্শন করেন। আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন, তার কোন পথপ্রদর্শক নেই। *(যুমার ঃ ২৩)*

[إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ] (٢) سورة الأنفال

অর্থাৎ, বিশ্বাসী (মু'মিন) তো তারাই, যাদের হৃদয় আল্লাহকে স্মরণ করার সময় কম্পিত হয় এবং যখন তাঁর আয়াত তাদের নিকট পাঠ করা হয়, তখন তা তাদের বিশ্বাস (ঈমান) বৃদ্ধি করে এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপরই ভরসা রাখে। *(আনফাল ঃ ২)*

কুরআনের মতো গ্রন্থ পাঠ করেও যারা ভয় পায় না, তারা কেমন মানুষ? কুরআন শুনে যারা কাঁদে না, উল্টে হাসে, তারা কেমন মানুষ? কুরআনের কথা শুনে অথবা কুরআন পড়ে অবাক হয়, অভিভূত হয়, আশ্চর্যান্বিত হয়, অথচ ঈমান আনে না, তারা কেমন লোক? মহান আল্লাহ বলেন,

[أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ (٥٩) وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ (٦٠) وَأَنتُمْ سَامِدُونَ] (غافلون) (٦١) سورة النجم

অর্থাৎ, তোমরা কি এই কথায় বিস্ময়বোধ করছ? এবং হাসি-ঠাট্টা করছ! ক্রন্দন করছ না? তোমরা তো উদাসীন। *(নাজম ঃ ৫৯-৬১)*

তাতে কুফরী, শির্ক ও পাপাচরণের এত শাস্তির কথা থাকা সত্ত্বেও তাদের কোন ভয় হয় না, কোন কান্না আসে না। তাতে এত উপদেশ থাকা সত্ত্বেও উপদেশ গ্রহণ না ক'রে মুখ ফিরিয়ে নেয়!

মহান আল্লাহ ঈমানদারদেরকে আহবান ক'রে বলছেন,

[أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ] (١٦) سورة الحديد

অর্থাৎ, যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে তাদের সময় কি আসেনি যে, আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে তাতে তাদের হৃদয় ভক্তি-বিগলিত হবে? এবং পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তাদের মত তারা হবে না? বহুকাল অতিক্রান্ত হয়ে গেলে যাদের অন্তর কঠিন হয়ে পড়েছিল। আর তাদের অধিকাংশই সত্যত্যাগী। *(হাদীদ ঃ ১৬)*

অবশ্যই এ কান্নার পশ্চাতে মারিফাত বা জ্ঞানের বড় দখল আছে। মনের ভিতরে জ্ঞান ও বিশ্বাস না জন্মালে কেউ কাঁদবে কেন? শোনা কথা অনেকের বিশ্বাস হয় না। 'এই পুকুরে শিকারী কুমির আছে'---এ কথা যে বিশ্বাস করে না, সে তো নির্দ্বিধায় সে পুকুরে সাঁতার কাটবেই। কিন্তু যে

বিশ্বাস করে, সে সে পুকুরে নামবেই না।

আমরা অনেক কিছু জানি না বলেই অনেক কাঁদতে পারি না। অনেক কিছু জানি না বলেই, অনেক হাসি, অনেক খেলি, অনেক অবহেলা করি।

আনাস ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা আমাদেরকে এমন ভাষণ শুনালেন যে, ওর মত (ভাষণ) কখনোও শুনিনি। তিনি বললেন, "যা আমি জানি, তা যদি তোমরা জানতে, তাহলে তোমরা কম হাসতে এবং অধিক কাঁদতে।" (এ কথা শুনে) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণ তাঁদের চেহারা ঢেকে নিলেন এবং তাদের বিলাপের রোল আসতে লাগল। *(বুখারী ও মুসলিম)*

অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে সাহাবীদের কোন কথা পৌঁছল। অতঃপর তিনি ভাষণ দিয়ে বললেন, "আমার নিকট জান্নাত ও জাহান্নাম পেশ করা হল। ফলে আমি আজকের মত ভাল ও মন্দ (একত্রে) কোন দিনই দেখিনি। যদি তোমরা তা জানতে, যা আমি জানি, তাহলে কম হাসতে, আর বেশি কাঁদতে।" সুতরাং সাহাবীদের জন্য সেদিনকার মত কঠিনতম দিন আর ছিল না। তাঁরা তাঁদের মাথা আবৃত করে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন।

আবূ যার্র ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন, "অবশ্যই আমি দেখি, যা তোমরা দেখতে পাও না। আকাশ কট্‌কট্‌ করে শব্দ করছে। আর এ শব্দ তার করা সাজে। এতে চার আঙ্গুল পরিমাণ এমন জায়গা নেই, যেখানে কোন ফিরিশ্তা আল্লাহর জন্য সিজদায় নিজ কপাল অবনত রাখেননি। আল্লাহর কসম! তোমরা যদি জানতে যা আমি জানি, তবে তোমরা কম হাসতে এবং বেশী কাঁদতে এবং বিছানায় তোমরা স্ত্রীদের সাথে আনন্দ উপভোগ করতে না। (বরং) তোমরা আল্লাহর আশ্রয় নেওয়ার জন্য পথে পথে বের হয়ে যেতে।" *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)*

আর তার জন্যই তিনি কাঁদতেন। নামায পড়তে পড়তে কাঁদতেন, কুরআন শুনে কাঁদতেন।

আম্বিয়াগণের অভ্যাস ছিল কান্নার, তেমনি অভ্যাস ছিল সাহাবাগণের।

ইরবায ইবনে সারিয়াহ ﵁ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে এমন মর্মস্পর্শী বক্তৃতা শুনালেন যে, তাতে অন্তর ভীত হল এবং চোখ দিয়ে অশ্রু বয়ে গেল।..... *(আবূ দাউদ, তিরমিযী)*

সুতরাং আল্লাহর ভয়ে কান্না জ্ঞানবান মু'মিনদের বৈশিষ্ট্য।

** আল্লাহর ভয়ে কান্নায় ছায়াহীন কিয়ামতে আরশের ছায়া পাওয়া যাবে।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা সাত ব্যক্তিকে সেই দিনে তাঁর (আরশের) ছায়া দান করবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না; (তারা হল,) ন্যায় পরায়ণ বাদশাহ (রাষ্ট্রনেতা)। সেই যুবক, যার যৌবন আল্লাহ তাআলার ইবাদতে অতিবাহিত হয়। সেই ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদসমূহের সাথে লটকে থাকে (মসজিদের প্রতি তার মন সদা আকৃষ্ট থাকে)। সেই দুই ব্যক্তি যারা আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে বন্ধুত্ব ও ভালবাসা স্থাপন করে; যারা এই ভালবাসার উপর মিলিত হয় এবং এই ভালবাসার উপরেই চিরবিচ্ছিন্ন (তাদের মৃত্যু) হয়। সেই ব্যক্তি যাকে কোন কুলকামিনী সুন্দরী (ব্যভিচারের উদ্দেশ্যে) আহবান করে, কিন্তু সে বলে, 'আমি আল্লাহকে ভয় করি।' সেই ব্যক্তি যে দান ক'রে গোপন করে; এমনকি তার ডান হাত যা প্রদান করে, তা তার বাম হাত পর্যন্তও জানতে পারে না। আর সেই ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে; ফলে তার উভয় চোখে পানি বয়ে যায়।" *(বুখারী-মুসলিম)*

সেই ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে। অতঃপর তার দুই চক্ষু বেয়ে অশ্রু বিগলিত হয়।

গোপনে তাঁর মহত্ত্ব ও বিশালত্বের কথা স্মরণ ক'রে ভয়ে তার কান্না আসে।

নিরালায় তাঁর প্রতি ভালবাসার কথা স্মরণ ক'রে তার চোখে অশ্রু-ঝরনা প্রবাহিত হয়।

মানুষ দুঃখের কথা অপরকে বলতে পারলে দুঃখের ভার লঘু হয়, অপরকে বলার মত না হলে কাঁদলে মনের বোঝা হাল্কা হয়। তাই নির্জনে তাঁর কাছে সব কথা বলে সে দু'চোখে অশ্রু ঝরায়।

প্রভু গো! তুমি আঘাত দিয়ে আমার কান্না দেখতে চাও, তাই আমি কাঁদি। তোমার বিরুদ্ধে তো কোন অভিযোগ নেই আমার, তাই আমি কাঁদি। সবারই আশা পূরণ করতে পারি না, তাই আমি কাঁদি। অন্যের দুঃখ দেখে দুঃখ পাই, তাই আমি কাঁদি। সবারই কান্না দেখেও সবারই চোখের পানি আমি মুছতে পারি না, তাই আমি কাঁদি। কাছে থেকেও অনেকের ব্যথা দূর করতে পারি না, তাই আমি কাঁদি। মানুষের দুর্দিন দেখে কাঁদি, কিন্তু সে কাঁদার লাভ কী, যদি তা দূর করতে না পারি? তাই আমি তোমার কাছে কাঁদি। ছোটবেলা থেকে কেঁদে আসছি, তাই আমি কাঁদি। আমি যে স্বপ্ন দেখছিলাম, তার ঘুম ভেঙ্গে গেছে, তাই আমি কাঁদি। আমার জীবনে একটি বড় অসঙ্গতি আছে, আমার বুকের ভিতরে বড় শূন্যতা আছে, আর সেই শূন্যতায় অশ্রু-সাগর আছে, তাই আমি কাঁদি। যা চাই, তা পাই না, তাই আমি কাঁদি। যা পেয়েছিলাম, তা হারিয়ে গেছে, তাই আমি কাঁদি। যা আছে, তা চাই না, তাই আমি কাঁদি।

একান্ত আপনজন ভুল বুঝে যখন আমাকে দূরে ঠেলে দেয়, তখন আমি তোমার কাছে কাঁদি। কেউ আমাকে মাথার ছাতা গণ্য করার পর যখন আমাকে পায়ের জুতা গণ্য করে, তখন আমি তোমার কাছে কাঁদি। ফুটপাত থেকে তুলে এনে রাজ-প্রাসাদে বসিয়ে যখন সে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে, তখন আমি তোমার কাছে কাঁদি। যখন তার কেউ ছিল না, তখন ছিলাম আমি, এখন তার সব হয়েছে, পর হয়েছি আমি। তাই আমি তোমার কাছে কাঁদি।

"আমার এ কূল ভাঙিয়াছে যে-বা আমি তার কূল বাঁধি,
যে গেছে বুকেতে আঘাত হানিয়া তার লাগি আমি কাঁদি;
যে মোরে দিয়েছে বিষভরা বাণ,
আমি দেই তারে বুকভরা গান;
কাঁটা পেয়ে তারে ফুল করি দান সারাটি জনম ভর,
আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর।"

লোকের দেওয়া আঘাতের বিনিময়ে আঘাত দিতে পারি না বলে আমি তোমার কাছে কাঁদি। গালির বদলে গালি দিয়ে প্রতিশোধ নিতে পারি না বলে আমি তোমার কাছে কাঁদি। তোমার সবল সৃষ্টি যখন আমার মত দুর্বলদের সুখসামগ্রী কেড়ে নেয়, তখন আমি তোমার কাছে কাঁদি। যখন আমি বিপদগ্রস্ত অথবা পীড়িত হই, তখন আমি তোমার কাছে কাঁদি।

যখন তুমি আমাকে পরীক্ষা কর, তখন আমি বিপদ গর্ভে নির্জনে ইউনুসের মত কাঁদি। যখন আমার আপনজনেরা যুক্তি ক'রে আমাকে দুনিয়ার বুক থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য বিপদের অন্ধকূপে নিক্ষেপ করে, তখন আমি ইউসুফের মত তোমার কাছে কাঁদি। যখন নোংরা-প্রকৃতির লোকেরা উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবে আমার চেহারায় কলঙ্কের কালিমা লেপন করে, তখন আমি আয়েশার মত তোমার কাছে কাঁদি।

যখন আয়ুব নবীর মত ব্যাধিগ্রস্ত হই, তখন আমি কাঁদি।

যখন মানুষে হিংসা ও পরশ্রীকাতরতাবশতঃ আমার যশ দেখে রোষ করে, তখন আমি তোমার কাছে কাঁদি।

লোককে তোমার অবাধ্যতা করতে দেখি, তাই আমি কাঁদি। পাপ থেকে বাঁচতে পারি না, তাই আমি কাঁদি। তোমার আযাবকে ভয় করি, তাই আমি কাঁদি। আমার আমল কবুল হবে কি না, তার আশঙ্কা হয়, তাই আমি কাঁদি। তোমার জান্নাতের লোভে কাঁদি। আমার চিরসঙ্গিনীদের বিরহে আমি কাঁদি। তাদের সাথে মিলনের তীব্র আকাঙ্ক্ষায় আমি কাঁদি।

বেহেশ্‌তী হুরীর মজনু আমি, মন রেখেছি বাঁধি,
মিলন আশায়, প্রেমের নেশায় এখন হতে কাঁদি।

লোকালয়ে কাঁদলে লোকে সত্যিই পাগল বলবে, তাই নির্জনে কাঁদি। মজলিসে কান্না করলে হয়তো রিয়া (লোক-দেখানি) হয়ে যাবে, তাই নিরালায় বসে অশ্রু মুছি। আমার মনের গোপন কথা শোনার মত তুমি ছাড়া কেউ নেই, তাই আমি তোমার কাছে কাঁদি। আমার মনের আকুল আবেদন শোনার মত কেউ নেই, তাই আমি তোমার দরবারে কাঁদি। কিছু

ব্যক্তিগত গোপন কথা থাকে, যা বাইরে বলা চলে না।

আমি তাদের মধ্যে একজন, যাদের জন্য উর্দু কবি বলেছেন,

'দুনিয়া মেঁ এ্যায়সে ভী কুছ লোগ হোতে হ্যাঁয়
জো মাহফিলুঁ মেঁ হাঁসতে হ্যাঁয়, মাগার তানহাঈ মেঁ রোতে হ্যাঁয়।'

মহান আল্লাহর ভয়ে কান্নায় তাঁর সন্তুষ্টি ও ভালবাসা লাভ হয়। এমন অশ্রু আল্লাহর নিকট খুব প্রিয়।

মহানবী ﷺ বলেছেন, "আল্লাহর নিকট দু'টি বিন্দু এবং দু'টি চিহ্ন অপেক্ষা কোন বস্তু প্রিয় নয়। (এক) ঐ অশ্রুবিন্দু, যা আল্লাহর ভয়ে বের হয়। আর (দুই) ঐ রক্তবিন্দু, যা আল্লাহর পথে বহিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু দু'টি চিহ্ন হল ঃ (এক) ঐ চিহ্ন যা আল্লাহর পথে (জিহাদ করে) হয়। আর (দুই) আল্লাহর কোন ফরয কাজ আদায় করে যে চিহ্ন (দাগ) পড়ে।" *(তিরমিযী, হাসান)*

আল্লাহর ভয়ে কান্নায় জাহান্নাম থেকে মুক্তিলাভ হয়। আল্লাহর ভয়ে কান্নায় এক বিন্দু অশ্রু জাহান্নামের আগুন নিভিয়ে দেয়।

মহানবী ﷺ বলেছেন, "দু'টি চক্ষুকে আগুন স্পর্শ করবে না। (এক) যে চক্ষু আল্লাহর ভয়ে কেঁদেছে এবং (দুই) যে চক্ষু আল্লাহর পথে (জিহাদে) পাহারা দিয়ে রাত্রি যাপন করেছে।" *(তিরমিযী)*

"সেই চক্ষুর জন্য জাহান্নাম হারাম ক'রে দেওয়া হয়েছে, (এক) যে চক্ষু আল্লাহর ভয়ে অশ্রু বিসর্জন করেছে এবং (দুই) যে চক্ষু আল্লাহর পথে (জিহাদে) পাহারা দিয়ে রাত্রি জাগরণ করেছে।" *(আহমাদ, নাসাঈ, হাকেম)*

"তিন ব্যক্তির চক্ষু জাহান্নাম দর্শন করবে না। (এক) যে চক্ষু আল্লাহর পথে (জিহাদে) পাহারা দিয়ে রাত্রি যাপন করেছে, (দুই) যে চক্ষু আল্লাহর ভয়ে কেঁদেছে এবং (তিন) যে চক্ষু আল্লাহর নিষিদ্ধ বস্তু দর্শন করা থেকে বিরত থেকেছে।" *(ত্বাবারানী)*

"সে ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করবে না, যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করল, যতক্ষণ না (দোহনকৃত) দুধ বাঁটে ফিরে যাবে। (অর্থাৎ দু'টোই

অসম্ভব)। আর আল্লাহর রাস্তার ধুলো ও জাহান্নামের ধোঁয়া একত্রিত হবে না।" *(তিরমিযী)*

আল্লাহর ভয়ে কান্নায় সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার জান্নাত পাওয়া যায়। যে চক্ষু আল্লাহর ভয়ে অশ্রু বইয়েছে, সে চক্ষু জাহান্নামের আগুন দর্শন করবে না। সে চক্ষু দর্শন করবে জান্নাতের সৌন্দর্য, সে চোখ লাভ করবে মহান আল্লাহর দীদার।

রাতের অন্ধকারে অথবা কোন নির্জন স্থানে আল্লাহকে স্মরণ ক'রে কাঁদলে এত বড় মর্যাদা আছে। তাই তো আরবী কবি বলেছেন,

ألا يا عينى ويحك أسعدينى .... بغزر الدمع فى ظلم الليالى

لعلك فى القيامة أن تفوزى .... بخير الدار في تلك العلالي

অর্থাৎ, হে আমার চোখ! সর্বনাশ তোর! রাতের অন্ধকারে অনেক অশ্রু বইয়ে আমাকে সুখী কর। সম্ভবতঃ কিয়ামতে উৎকৃষ্ট গৃহে সেই কক্ষসমূহ লাভ করবি।

আল্লাহর ভয়ে কান্নায় জান্নাতে 'তুবা' লাভ হবে।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "তার জন্য 'তুবা', যে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখে, স্বগৃহে অবস্থান করে এবং নিজের পাপের জন্য কান্না করে।" *(ত্বাবারানী, আউসাত্ব ও স্বাগীর)*

জ্ঞাতব্য যে, 'তুবা' জান্নাতের নাম। অথবা 'তুবা' জান্নাতের একটি গাছের নাম। অথবা তার অর্থ হল, আনন্দ, বা কল্যাণময় জীবন। *(দ্রঃ মিরআতুল মাফাতীহ ইত্যাদি)*

হাদীসে বর্ণিত যে, "জান্নাতে 'তুবা' নামের একটি গাছ আছে। এ গাছটি ১০০ বছরের অতিক্রম্য জায়গা জুড়ে অবস্থিত। এর মোছা থেকে জান্নাতীদের বস্ত্র নির্মিত হবে।" *(আহমাদ, সিঃ সহীহাহ ১৯৮৫নং)*

আল্লাহর ভয়ে কান্নার নমুনা

আল্লাহর ভয়ে কান্নার সর্বশ্রেষ্ঠ নমুনা আমাদের শেষনবী ﷺ-এর। যেহেতু

তাঁর হৃদয়ে ছিল সবচেয়ে বেশী আল্লাহর জ্ঞান। যেহেতু তিনিই সবচেয়ে বেশী আল্লাহকে চিনতেন। তিনিই সবচেয়ে বেশী তাঁকে ভয় করতেন।

আনাস ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা আমাদেরকে এমন ভাষণ শুনালেন যে, ওর মত (ভাষণ) কখনোও শুনিনি। তিনি বললেন, "যা আমি জানি তা যদি তোমরা জানতে, তাহলে তোমরা কম হাসতে এবং অধিক কাঁদতে।" (এ কথা শুনে) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণ তাঁদের চেহারা ঢেকে নিলেন এবং তাদের বিলাপের রোল আসতে লাগল। *(বুখারী ও মুসলিম)*

আব্দুল্লাহ ইবনে শিখ্খীর ﷺ বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এলাম এমতাবস্থায় যে, তিনি নামায পড়ছিলেন এবং তাঁর বুক থেকে উনানে স্থিত হাঁড়ির (ফুটন্ত পানির) মত কান্নার অস্ফুট রোল শোনা যাচ্ছিল। *(আহমাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী)*

উবাইদ বিন উমাইর ﷺ বলেন, একদা আমি আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)কে বললাম, আল্লাহর রসূল ﷺ-এর জীবনে সবচেয়ে বড় আশ্চর্যময় ঘটনা কী দেখেছেন, তা আমাদেরকে বলুন। তিনি ক্ষণকাল নীরব থেকে বললেন, 'এক রাত্রে (নবী ﷺ) আমাকে বললেন, "আয়েশা! আজ রাতে আমাকে আমার প্রতিপালকের ইবাদতের জন্য ছেড়ে দাও।" আমি বললাম, 'আল্লাহর কসম! আমি আপনার নৈকট্য চাই এবং তাই চাই, যা আপনাকে আনন্দ দান করে।' সুতরা তিনি উঠে ওযূ করলেন এবং নামায পড়তে শুরু করলেন। নামাযে তিনি কাঁদতে লাগলেন। তিনি বসে ছিলেন, (চোখের পানিতে) তাঁর কোল ভিজে গেল। তারপরও কাঁদতে লাগলেন। (সিজদায় গেলে অশ্রুতে) মাটি ভিজে গেল! (ফজরের আগে) বিলাল নামাযের খবর দিতে এলেন। তিনি যখন তাঁকে কাঁদতে দেখলেন, তখন বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি কাঁদছেন? অথচ আল্লাহ আপনার পূর্বাপর সমস্ত গোনাহ মাফ ক'রে দিয়েছেন!' তিনি বললেন, "আমি কি (আল্লাহর) শুকরগুযার বান্দা হব না? আজ রাত্রে

আমার উপর কয়েকটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। ধ্বংস তার জন্য, যে তা পড়েছে, অথচ তা নিয়ে একটু চিন্তা-ভাবনা ক'রে দেখেনি।

[إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُوْلِي الألْبَابِ (١٩٠) الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ] (١٩١) سورة آل عمران

অর্থাৎ, নিশ্চয় যারা বিশ্বাস করার পর অবিশ্বাস করে এবং যাদের অবিশ্বাস-প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে, তাদের তওবা কখনো মঞ্জুর করা হয় না। এরাই তো পথভ্রষ্ট। নিশ্চয় যারা অবিশ্বাস করেছে এবং অবিশ্বাসী অবস্থায় মারা গেছে, তাদের কারো পক্ষ হতে পৃথিবী-পূর্ণ স্বর্ণ বিনিময়স্বরূপ প্রদান করলেও কখনো তা কবুল করা হবে না। এ সকল লোকের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং এদের কোন সাহায্যকারীও নেই। *(আলে ইমরান ঃ ৯০-৯১, ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ১৪৬৮-নং)*

সা'দ ﷺ সালমান ﷺ-কে দেখা করতে এলেন। সালমান ﷺ কাঁদতে লাগলেন। সা'দ বললেন, 'আপনি কাঁদছেন কীসের জন্য হে আবূ আব্দুল্লাহ! আল্লাহর রসূল ﷺ ইন্তিকাল ক'রে গেছেন, তিনি আপনার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। আপনি হওযে-কওষরের কাছে তাঁর সঙ্গী হবেন। আপনার সাথীবর্গের সাথে সাক্ষাৎ করবেন।' সালমান ﷺ বললেন, 'আমি মৃত্যুভয়ে কাঁদছি না, দুনিয়ার (জীবনের) লোভেও না। কিন্তু আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদেরকে নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন যে, "তোমাদের জন্য যেন একজন সওয়ারী (মুসাফিরের) সম্বল পরিমাণ দুনিয়ার (সম্পদ) যথেষ্ট হয়।" আর আজ আমার চারিপাশে এত সম্পদ!' এ কথা শুনে সা'দ ﷺ-ও কাঁদতে লাগলেন।

অথচ তাঁর পাশে ছিল একটি ঠেস দেওয়ার বালিশ, একটি ভোজনপাত্র, একটি কাপড় ধোওয়ার পাত্র ও একটি ওযূর পাত্র! (যার মূল্য ৪০ দিরহাম মাত্র।) *(হাকেম, বাইহাক্বী, ইবনে আবী শাইবা, সঃ তারগীব ৩২২৪নং)*

একদা আব্দুর রহমান বিন আওফ ﷺ-এর নিকট তাঁর খাবার আনা হল। তিনি বললেন, 'মুসআব বিন উমাইর নিহত হলেন। তিনি আমার চেয়ে ভাল লোক ছিলেন। তাঁকে কাফনানোর সময় একটি চাদর ছাড়া অন্য কিছু জুটল না। হামযা (অথবা অন্য একজন) নিহত হলেন। তিনি আমার চেয়ে ভাল লোক ছিলেন। তাঁকে কাফনানোর সময় একটি চাদর ছাড়া অন্য কিছু জুটল না। এখন আমার ভয় হয় যে, হয়তো আমাদের পুণ্যরাশি পার্থিব জীবনেই ভোগ করতে দেওয়া হয়েছে।' অতঃপর তিনি কাঁদতে লাগলেন। *(বুখারী)*

আবূ হুরাইরা ﷺ তাঁর (শেষ) রোগে কাঁদতে লাগলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'কীসের জন্য কাঁদছেন আপনি?' তিনি বললেন, 'শোনো! আমি তোমাদের এই দুনিয়ার জন্য কাঁদিনি। আমি কাঁদছি আমার সফরের দূরত্ব ও সম্বলের স্বল্পতার জন্য! আমি এখন জান্নাত অথবা জাহান্নামের দিকে চড়তে লেগেছি। আর জানি না যে, দু'টির মধ্যে কোন্‌টির দিকে আমাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হবে!' *(হিল্‌য়াতুল আওলিয়া)*

তামীম দারী এক রাত্রে এই আয়াত পড়ে সকাল পর্যন্ত কাঁদতে থাকলেন,

[أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاء مَحْيَاهُم وَمَمَاتُهُمْ سَاء مَا يَحْكُمُونَ] (٢١) سورة الجاثية

অর্থাৎ, দুষ্কৃতকারীরা কি মনে করে যে, আমি জীবন ও মৃত্যুর দিক দিয়ে ওদেরকে তাদের সমান গণ্য করব, যারা বিশ্বাস করে এবং সৎকাজ করে? ওদের ফায়সালা কত নিকৃষ্ট। *(জাষিয়াহ ঃ ২১, ত্বাবারানী)*

হুযাইফা ইবনুল য়্যামান ﷺ খুব কঠিন কাঁদা কাঁদতেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'আপনি কী জন্য কাঁদেন?' তিনি বললেন, 'জানি না আমার আগমন কীসের উপর হবে, সন্তুষ্টির উপর, নাকি অসন্তুষ্টির উপর।' *(তারীখে হলব ৩/৩৩০)*

সা'দ বিন আখরাম বলেন, 'ইবনে মাসঊদ ﷺ পথে কামারশালের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আঙ্গার থেকে লোহা বের করা দেখলে দাঁড়িয়ে সেই

অগ্নিদগ্ধ গলা লোহাকে দেখে কাঁদতেন।' *(ইবনে আবী শাইবাহ)*

একদা আবূ মূসা আশআরী ﷺ বাসরায় খুতবা দিলেন, তাতে তিনি জাহান্নাম সম্বন্ধে আলোচনা ক'রে কাঁদতে লাগলেন। এমনকি তাঁর চোখের পানি মিম্বরে পড়তে লাগল। তা দেখে লোকেরাও কঠিনভাবে কাঁদতে লাগল। *(আত্‌-তাখবীফু মিনান্নার ১/৫১)*

একদা ইবনে উমার ﷺ সূরা মুত্বাফ্‌ফিফীন পড়ছিলেন। যখন তিনি এই আয়াতে পৌঁছলেন,

[يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ] (٦) سورة المطففين

অর্থাৎ, যেদিন দাঁড়াবে সমস্ত মানুষ বিশ্ব-জাহানের প্রতিপালকের সম্মুখে। *(মুত্বাফ্‌ফিফীন ঃ ৬)*

তখন তিনি কাঁদতে লাগলেন। কাঁদতে কাঁদতে তিনি পড়ে গেলেন এবং পরবর্তী আর কোন আয়াত পড়তে পারলেন না। *(যুহ্‌দ, ইবনে হাম্বল ১/১৯২)*

তিনি এই আয়াত পড়েও খুব কাঁদতেন,

[أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنْ الْحَقِّ وَلا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمْ الأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ]

অর্থাৎ, যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে তাদের সময় কি আসেনি যে, আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে তাতে তাদের হৃদয় ভক্তি-বিগলিত হবে? এবং পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তাদের মত তারা হবে না? বহুকাল অতিক্রান্ত হয়ে গেলে যাদের অন্তর কঠিন হয়ে পড়েছিল। *(হাদীদ ঃ ১৬, ইবনে আবী শাইবাহ, হিলয়াতুল আওলিয়া)*

মাসরূক বলেন, আমি আয়েশার নিকট এই আয়াতগুলি পড়লাম,

[وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ (٢٢) يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْساً لاَ لَغْوٌ فِيهَا وَلاَ تَأْثِيمٌ (٢٣) وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ (٢٤) وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ

يَتَسَاءَلُونَ (٢٥) قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ (٢٦) فَمَنَّ اللهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ] (٢٧) الطور

অর্থাৎ, আমি তাদেরকে ঢের দেব ফল-মূল এবং গোশ্ত, যা তারা পছন্দ করে। সেখানে তারা একে অপরের নিকট হতে গ্রহণ করবে (মদ ভরা) পান-পাত্র, যা হতে পান করলে কেউ অসার কথা বলবে না এবং পাপ কর্মেও লিপ্ত হবে না। তাদের (সেবায়) তাদের কিশোরেরা তাদের আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে; যেন তারা সুরক্ষিত মুক্তা সদৃশ। তারা একে অপরের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করবে এবং বলবে, 'নিশ্চয় আমরা পূর্বে পরিবার-পরিজনের মধ্যে শংকিত অবস্থায় ছিলাম। অতঃপর আমাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে উত্তপ্ত ঝড়ো হাওয়ার শাস্তি হতে রক্ষা করেছেন। *(তূর ঃ ২২-২৭)*

তা শুনে তিনি কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার প্রতি অনুগ্রহ করো এবং আমাকে উত্তপ্ত ঝড়ো হাওয়ার শাস্তি হতে রক্ষা করো।' *(ইবনে আবী শাইবাহ)*

একদা হাসান (রঃ) কাঁদছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, আপনি কী জন্য কাঁদছেন? উত্তরে তিনি বললেন, 'আমার ভয় হচ্ছে, আল্লাহ কাল আমাকে অনীহার সাথে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন!' *(স্বিফাতুস স্বাফওয়াহ ৩/২৩৩)*

একদা মুআয ﷺ কাঁদছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা হল, আপনি কী জন্য কাঁদছেন? উত্তরে তিনি বললেন, 'কিয়ামতে আল্লাহ আয্যা অজাল্ল দু'মুঠোর এক মুঠো জান্নাতে এবং অপর মুঠো জাহান্নামে হবে। আর আমি জানি না যে, আমি কোন মুঠোয় থাকব!' *(শাহরু রামাযান ১/১৭)*

আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহাহ তাঁর স্ত্রীর কোলে মাথা রেখে শুয়েছিলেন। হঠাৎ তিনি কাঁদতে লাগলেন। তা দেখে তাঁর স্ত্রীও কাঁদতে লাগলেন। (তা দেখে বাড়ির অন্য সকল কাঁদতে লাগল।) তিনি বললেন, 'তোমরা কাঁদছ কেন?' বলা হল, 'আপনি যে কাঁদছেন।' তিনি বললেন, 'আমি মহান আল্লাহর এই বাণী স্মরণ ক'রে কাঁদছি,

[وَإِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْماً مَقْضِيّاً] ﴿ مريم ٧١ ﴾

অর্থাৎ, তোমাদের প্রত্যেকেই তাতে প্রবেশ করবে; এটা তোমার প্রতিপালকের অনিবার্য সিদ্ধান্ত। *(মারয়্যাম ঃ ৭১)*

আর আমি জানি না যে, আমি সেখান থেকে পরিত্রাণ পাব কি না!' *(তারীখে দিমাশ্ক)*

ইবনে শিমাসাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আম্র ইবনে আ'স ﷺ-এর মরণোন্মুখ সময়ে আমরা তাঁর নিকটে উপস্থিত হলাম। তিনি অনেক ক্ষণ ধরে কাঁদতে থাকলেন এবং দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এরূপ অবস্থা দেখে তাঁর এক ছেলে বলল, 'আব্বাজান! আপনাকে কি রাসূলুল্লাহ ﷺ অমুক জিনিসের সুসংবাদ দেননি? আপনাকে কি রাসূলুল্লাহ ﷺ অমুক জিনিসের সুসংবাদ দেননি?' এ কথা শুনে তিনি তাঁর চেহারা সামনের দিকে ক'রে বললেন, 'আমাদের সর্বোত্তম পুঁজি হল, এই সাক্ষ্য প্রদান যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রসূল। আমি তিনটি স্তর অতিক্রম করেছি।

(এক) আমার চেয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি বড় বিদ্বেষী আর কেউ ছিল না। তাঁকে হত্যা করার ক্ষমতা অর্জন করাই ছিল আমার তৎকালীন সর্বাধিক প্রিয় বাসনা। যদি (দুর্ভাগ্যক্রমে) তখন মারা যেতাম, তাহলে নিঃসন্দেহে আমি জাহান্নামী হতাম।

(দুই) তারপর যখন আল্লাহ তাআলা আমার অন্তরে ইসলাম প্রক্ষিপ্ত করলেন, তখন নবী ﷺ-এর নিকট হাযির হয়ে নিবেদন করলাম, 'আপনার ডান হাত প্রসারিত করুন। আমি আপনার হাতে বায়আত করতে চাই।' বস্তুতঃ তিনি ডান হাত বাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু আমি আমার হাত টেনে নিলাম। তিনি বললেন, "আম্র! কী ব্যাপার?" আমি নিবেদন করলাম, 'একটি শর্ত আরোপ করতে চাই।' তিনি বললেন, "শর্তটি কি?" আমি বললাম, 'আমাকে ক্ষমা করা হোক---শুধু এতটুকুই।' তিনি বললেন, "তুমি কি জানো না যে, ইসলাম পূর্বের সমস্ত পাপরাশিকে মিটিয়ে দেয়, হিজরত পূর্বের সমস্ত পাপরাশিকে নিশ্চিহ্ন ক'রে ফেলে এবং

হজ্জ্বও পূর্বের পাপসমূহ ধ্বংস করে দেয়?”

তখন থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ অপেক্ষা অধিক প্রিয় মানুষ আর কেউ নেই। আর আমার দৃষ্টিতে তাঁর চেয়ে সম্মানীয় ব্যক্তি আর কেউ নেই। তাঁকে সম্মান ও শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করার অবস্থা এরূপ ছিল যে, তাঁর দিকে নয়নভরে তাকাতে পারতাম না। যার ফলে আমাকে কেউ যদি প্রশ্ন করে যে, আল্লাহর রসূল ﷺ-এর গঠনাকৃতি কিরূপ ছিল? আমি তা বলতে পারব না। এ অবস্থায় যদি আমার মৃত্যু হয়ে যেত, তাহলে আশা ছিল যে, আমি জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।

(তিন) তারপর বহু দায়িত্বপূর্ণ বিষয়াদির খপ্পরে পড়লাম। জানি না, তাতে আমার অবস্থা কি? সুতরাং আমি মারা গেলে কোন মাতমকারিণী অথবা আগুন যেন অবশ্যই আমার (জানাযার) সাথে না থাকে। তারপর যখন আমাকে দাফন করবে তখন যেন তোমরা আমার কবরে অল্প অল্প করে মাটি দেবে। অতঃপর একটি উঁট যবেহ করে তার মাংস বন্টন করার সময় পরিমাণ আমার কবরের পাশে অপেক্ষা করবে। যাতে আমি তোমাদের সাহায্যে নিঃসঙ্গতা দূর করতে পারি এবং আমার প্রভুর প্রেরিত ফিরিশ্তাদের সঙ্গে কিরূপ বাক্-বিনিময় করি তা দেখে নিই।’ *(মুসলিম)*

সালামাহ আল-আহমার বলেন, একদা বাদশা হারুন রশীদের নিকট গমন করলাম। তাঁর বিভিন্ন বালাখানা ও রাজমহল দেখে আমি তাঁকে বললাম, ‘আপনার মহলখানা বেশ প্রশস্ত। আপনার মৃত্যুর পর যদি আপনার কবরটাও প্রশস্ত হয়, তবেই ভাল।’ এ কথা শুনে বাদশা কাঁদতে লাগলেন। অতঃপর বললেন, ‘হে সালামাহ! আপনি আমাকে সংক্ষেপে আরো কিছু উপদেশ দিন।’ আমি বললাম, ‘হে আমীরুল মু’মিনীন! আপনি কোন মরুভূমিতে থেকে যদি পিপাসিত হন, তাহলে আপনার পিপাসা মিটাবার জন্য কত অর্থ দিয়ে এক ঢোক পানি কিনবেন?’ তিনি বললেন, ‘আমার অর্ধেক রাজত্ব দিয়ে।’ আমি বললাম, ‘অতঃপর তা পান ক’রে তা যদি পেট থেকে বের হতে না চায়, তাহলে তা বের করার জন্য কী ব্যয় করবেন?’ বললেন, ‘বাকী অর্ধেক রাজত্ব ব্যয় ক’রে দেব।’

আমি বললাম, ‘অতএব সে দুনিয়ার উপর আল্লাহর অভিশাপ, যে দুনিয়ার মূল্য হল এক ঢোক পানি ও এক গোড় পেশাব!’ এ কথায় বাদশা হারুন আরো জোরে কেঁদে উঠলেন।

একদা উমার বিন আব্দুল আযীযকে দেখা গেল তিনি রোদে বসে আছেন। জিজ্ঞাসা করা হল, ‘আপনি কি অসুস্থ?’ বললেন, ‘না, আমি আমার (পরিহিত) কাপড় শুকাচ্ছি!’ প্রশ্নকারী অবাক হয়ে বলল, ‘আপনার পোশাক কী, হে আমীরুল মু’মিনীন?’ বললেন, ‘লুঙ্গি, কামীস ও চাদর।’ বলা হল, ‘আর একটি ক’রে লুঙ্গি, কামীস ও চাদর গ্রহণ করেন না কেন?’ তিনি বললেন, ‘ছিল, পুরনো হয়ে নষ্ট হয়ে গেছে।’ বলা হল, ‘অন্যও তো গ্রহণ করতে পারেন?’ এ কথা শুনে তিনি মাথা নিচু ক’রে কেঁদে ফেললেন এবং বললেন,

[تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ] (٨٣) سورة القصص

অর্থাৎ,এ পরলোকের আবাস; যা আমি নির্ধারিত করি তাদেরই জন্য যারা এ পৃথিবীতে উদ্ধত হতে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না। সাবধানীদের জন্য শুভ পরিণাম। *(ক্বাস্বাস ঃ ৮৩)*

আল্লাহর ভয়ে কান্নার বিধান

আল্লাহর ভয়ে কান্না অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইবাদত। এ কান্না মানুষের তাক্বওয়া ও পরহেযগারীর দলীল। সুতরাং এ কান্না অবশ্যই ভাল এবং তা মুসলিমের নিকট থেকে বাঞ্ছনীয়।

তবে এ কান্না নির্জনে ভাল। লোকালয়ে হলে নিঃশব্দে ভাল। সংবরণ করতে না পারলে---সে কথা ভিন্ন।

পক্ষান্তরে উদ্দেশ্য যদি লোক-প্রদর্শন হয়, তাহলে তা শির্কে পরিণত হতে পারে। মনে প্রশংসার লোভ এলে সে কান্নার পানি জাহান্নামের

আগুনের ইন্ধন হতে পারে।

এই জন্য সলফে সালেহীন গোপনে কাঁদতেন। আল্লাহর ভয়ে চোখে পানি এসে গেলে তা যেন-তেন-প্রকারেণ গোপন করার চেষ্টা করতেন।

মুহাম্মাদ বিন আসলাম তূসীর খাদেম আবূ আব্দুল্লাহ বলেন, মুহাম্মাদ 'রিয়া'কে খুব ভয় করতেন। এই জন্য তিনি নফল নামায বাড়িতে পড়তেন। তিনি বাড়িতে নিজের কামরায় প্রবেশ ক'রে দরজা বন্ধ ক'রে নিতেন। জানি না, তিনি কী করতেন? অবশেষে একদিন তার ছোট বাচ্চাটা তাঁর কান্নার নকল করছে। তা দেখে তার মা তাকে বারণ করল। আমি তাকে বললাম, 'কী ব্যাপার?' সে বলল, 'আবুল হাসান এই ঘরে প্রবেশ ক'রে কুরআন পড়েন ও কান্না করেন। তাই বাচ্চাটা শুনে ওঁর নকল করছে।' তিনি যখন কামরা থেকে বের হতেন, তখন আগে নিজের চেহারা ধুয়ে নিয়ে সুরমা লাগিয়ে নিতেন। যাতে কান্নার কোন চিহ্ন অবশিষ্ট না থাকে! *(হিল্য়াতুল আওলিয়া ৯/২৪৩)*

আওযায়ী কোন সময় লোকের সামনে কাঁদতেন না। কিন্তু তাঁর বাড়ির ভিতর থেকে বাইরে কান্নার আওয়াজ শোনা যেত।

লোকালয়ে আইয়ুব সাখতিয়ানীর কান্না ও চোখে পানি এসে গেলে নাক ঢেকে নিতেন এবং (সর্দির ভান ক'রে) বলতেন, 'সর্দি কঠিন কত!' যাতে লোকে তাঁর কান্না বুঝতে না পারে।

হাসান বাসরী বলেন, 'নেক লোকের চোখে পানি এসে গেলে মজলিস থেকে উঠে যান। যাতে কোন মানুষ তাঁর অশ্রু দেখতে না পায়।'

বলা বাহুল্য, যাঁরা জামাআতে ইমামের ক্বিরাআত শুনতে শুনতে উচ্চ রবে কেঁদে ফেলেন, তাঁদের উচিত নিজেকে সংবরণ ক'রে নেওয়া। নচেৎ তাতে পার্শ্ববর্তী নামাযীদের ডিষ্টার্ব হবে এবং মনে প্রশংসার লোভ ঢুকলে সওয়াবের জায়গায় গোনাহ হবে। অবশ্য কেউ যদি চেষ্টা সত্ত্বেও সংযত করতে না পারে, তাহলে সে কথা ভিন্ন।

আহলে ইল্মগণ বলেন, 'তিন সময় মুনাফিক্বী ও রিয়া থেকে বাঁচ; লোকের সামনে আল্লাহর যিকর করার সময়, লোকের সামনে কাঁদার সময় এবং লোকের সামনে দান করার সময়।'

তাঁরা আরও বলেন, 'তোমার উপরে ছয় সময়ে শয়তানের হাসি থেকে সাবধান থেকো; রাগের সময়, গর্বের সময়, তর্কের সময়, লোকমুখে তোমার প্রশংসার সময়, বক্তৃতাকালে উত্তেজনার সময় এবং নসীহতকালে কাঁদার সময়।'

আল্লাহর ভয়ে কাঁদতে মন চায় কাঁদুন। নিরালায় কাঁদুন। তবে শুধু কাঁদাই উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য হল, হৃদয়ের প্রতিক্রিয়া এবং সেই প্রতিক্রিয়া অনুসারে কাজ।

আজ সত্য কান্নার বড় অভাব। কান্নার 'হো-হো' শব্দ শোনা যায় বহু জালসার মজলিসে, মসজিদে বা ওয়ায মহফিলে। কিন্তু তার কোন প্রতিক্রিয়া ও বাস্তবতা পরিদৃষ্ট হয় না।

আজ কোন বাড়ি থেকে কান্না শোনা গেলে জানতে হবে, কেউ মরেছে অথবা কোন বিপদ হয়েছে। আল্লাহর ভয়ে কান্নার কোন শব্দ কান পেতেও শোনা যায় না। কিন্তু সলফদের বাড়ি থেকে আল্লাহর ভয়ে কান্নার শব্দ ভেসে আসত, নামায অথবা তেলাঅতের সময় কান্নার আওয়াজ কানে পড়ত।

পক্ষান্তরে আমাদের বাড়ি থেকে বাইরের লোকে শুনতে পায় অট্ট-হাসির শব্দ অথবা গান-বাজনার মন মাতানো সুর-ঝংকার। তাঁদের হাল, আর আমাদের হাল। আমাদের অবস্থা কি নাজেহাল হবে না?

কান্না কখন আসে?

১। আল্লাহ সম্বন্ধে জ্ঞান ও মারিফাত অর্জন করলে তাঁর ভয়ে কান্না আসে। যেহেতু মহান আল্লাহ আহলে ইল্মদের ব্যাপারেই বলেছেন,

[وَيَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ] الإسراء/ ١٠٩

"তারা কাঁদতে কাঁদতে ভূমিতে লুটিয়ে (সিজদা) দেয়।" *(বানী ইস্রাঈল ঃ ১০৯)*

আল্লাহর মহানত্ব জেনে তাঁর ভয়ে কান্না করুন। তাইমী বলেন, 'যাকে

এমন ইল্ম দান করা হয়েছে, যা তাকে কাঁদতে উদ্বুদ্ধ করে না, সে এ কথার উপযুক্ত যে, তাকে ইল্ম থেকে বঞ্চিত করা হত। যেহেতু মহান আল্লাহ আহলে ইল্মের প্রশংসা ক'রে বলেছেন, 'তারা কাঁদতে কাঁদতে ভূমিতে লুটিয়ে (সিজদা) দেয় এবং এ (কুরআন) তাদের বিনয় বৃদ্ধি করে।' *(দারেমী)*

আহলে ইল্ম ও উলামাগণই কাঁদেন, যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন,

[إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء] (٢٨) سورة فاطر

অর্থাৎ, আল্লাহর দাসদের মধ্যে জ্ঞানীরাই তাঁকে ভয় ক'রে থাকে। *(ফাত্বির ঃ ২৮)*

আরবী কবি বলেন,

نوح الحمام على الغصون شجاني ... ورأى العذول صبابتي فبكاني

إن الحمام ينوح من خوف النوى ... وأنا أنوح مخافة الرحمن

অর্থাৎ, ডালের উপর ঘুঘু পাখীর শোক-ডাক আমার শোক উথলে দিল। নিন্দুক আমার আসক্তি দেখে আমাকে কাঁদিয়ে দিল। ঘুঘু মাতম করে বীজের ভয়ে। আর আমি কান্না করি রহমানের ভয়ে।

২। অর্থ বুঝে মিষ্টি সুরে কুরআন তিলাঅত করলে অথবা শুনলে চোখে পানি আসবে। যেহেতু তিলাঅত মু'মিনকে কাঁদতে উদ্বুদ্ধ করবে। মহান আল্লাহ বলেন,

[قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لاَ تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ سُجَّداً * وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولاً * وَيَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعاً] الاسراء/ ١٠٧-١٠٩

অর্থাৎ, তুমি বল, 'তোমরা কুরআনে বিশ্বাস কর অথবা না কর, যাদেরকে এর পূর্বে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তাদের নিকট যখন এটা পাঠ করা হয়, তখনই তারা চেহারা লুটিয়ে সিজদায় পড়ে এবং বলে, আমাদের প্রতিপালক পবিত্র, মহান! অবশ্যই আমাদের প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি

কার্যকর হয়েই থাকে। আর তারা কাঁদতে কাঁদতে ভূমিতে লুটিয়ে (সিজদা) দেয় এবং এ (কুরআন) তাদের বিনয় বৃদ্ধি করে।' *(বানী ইস্রাঈল ঃ ১০৭-১০৯)*

[أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرائيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّداً وَبُكِيّاً) مريم/ ٥٨

অর্থাৎ, নবীদের মধ্যে যাদেরকে আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন এরাই তারা, আদমের ও যাদেরকে আমি নূহের সাথে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম তাদের বংশোদ্ভূত, ইব্রাহীম ও ইস্রাঈলের বংশোদ্ভূত ও যাদেরকে আমি পথ নির্দেশ করেছিলাম ও মনোনীত করেছিলাম তাদের অন্তর্ভুক্ত। তাদের নিকট পরম করুণাময়ের আয়াত আবৃত্তি করা হলে তারা ক্রন্দন করতে করতে সিজদায় লুটিয়ে পড়ত। *(মারয়্যাম ঃ ৫৮)*

ইবনে মাসঊদ ﷺ বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, "তুমি আমার সামনে কুরআন তিলাঅত কর।" উত্তরে আমি আরজ করলাম, 'আমি আপনার সামনে তিলাঅত করব, অথচ তা আপনার উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে?' তিনি বললেন, "আমি অন্যের কাছ থেকে তা শুনতে ভালবাসি।" অতএব আমি সূরা 'নিসা' তিলাঅত করলাম। পরিশেষে যখন আমি এ আয়াতে এসে পৌঁছলাম; যার অর্থ, "তখন তাদের কী অবস্থা হবে, যখন প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে একজন সাক্ষী (নবী) উপস্থিত করব এবং তোমাকেও তাদের সাক্ষীরূপে উপস্থিত করব?" তখন তিনি আমাকে বললেন, "যথেষ্ট, এবার থাম।" আমি তাকিয়ে দেখলাম, তাঁর দু'চোখ থেকে অশ্রুধারা প্রবাহিত হচ্ছে। *(বুখারী ৫০৫০, মুসলিম ৮০০নং)*

৩। নামাযে কান্না আসে, বিশেষ ক'রে তাহাজ্জুদের নামাযে। সুতরাং নামায পড়ুন সেই ব্যক্তির মতো, যে ব্যক্তি মনে করে, সে যেন আল্লাহকে দেখছে অথবা আল্লাহ তাকে দেখছেন। অথবা সেই ব্যক্তির মতো, যে ব্যক্তি এই নামাযের পর আর কোন নামায পড়ার সুযোগ পাবে না। এই

নামাযের পরেই তাকে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হবে। যদি এই কল্পনা আপনি করতে পারেন, তাহলে অবশ্যই আপনার কান্না আসবে।

৪। নির্জনে কাঁদার মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব জানুন। মাহাত্ম্য জানলে আপনার কান্না আসবে।

৫। আপনি যে পাপ ক'রে ফেলেছেন, তার জন্য আল্লাহকে ভয় করুন। সে পাপ আল্লাহ মাফ করবেন কি না, সে নিয়ে ভাবুন ও কান্না করুন।

উক্ববাহ বিন আমের ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! পরিত্রাণের উপায় কী?' তিনি বললেন, "তুমি তোমার জিহ্বাকে নিজের আয়ত্তাধীন কর, স্বগৃহে অবস্থান কর, আর তোমার পাপের জন্য (আল্লাহর নিকট) রোদন কর।" *(সহীহ তিরমিযী ১৯৬১ নং)*

আর উল্লিখিত হয়েছে যে, সলফগণ পাপের দুশ্চিন্তায় কান্না করতেন। কেউ কেউ বলতেন, 'আল্লাহ আমাকে পাপ করতে দেখেছেন। আমার ভয় হয়, তিনি হয়তো বলবেন, "দূর হয়ে যা আমার কাছ থেকে। আমি তোর প্রতি রাগান্বিত।" *(আয্-যাহরুল ফা-য়িহ, ইবনুল জাযরী ১/৩০)*

হাসান বাসরী এক রাত্রে কেঁদে উঠলেন। তা দেখে বাড়ির লোকেও কাঁদতে শুরু করল। কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, 'একটি গোনাহর কথা মনে পড়ে গেল, তাই কান্না এসে গেল!' *(তাবস্বিরাহ, ইবনুল জাওযী ১/২৮০)*

আরবী কবি বলেন,

أنام على سهو وتبكي الحمائم ... وليس لها جرم ومني الجرائم

كذبت لعمرو الله لو كنت عاقلاً ... لما سبقتني بالبكاء الحمائم

অর্থাৎ, আমি জেগে জেগে ঘুমাই, আর পায়রা কান্না করে। অথচ তার কোন পাপ নেই; বরং আমিই পাপী।

মিথ্যা বলছি আল্লাহর কসম! যদি আমি জ্ঞানী হতাম, তাহলে আমার আগে পায়রা কাঁদত না।

৬। তওবার সময় অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়ে কান্না করুন।

ভিজে ডাল আগুনে দিলে তার একদিক পুড়ে, আর অপর দিক থেকে

পানি বের হয়। অনুরূপ পাপ করার ফলে হৃদয়ে অনুতাপের দহন থাকলে চোখ দিয়ে পানি বের হয়ে আসে। লজ্জায় সৃষ্টিকর্তার কাছে মাথা হেঁট হয়, আর অনুতাপে চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়।

কথিত আছে যে, দাউদ ﷺ যখন ভুল করেছিলেন, তখন তিনি এমন কাঁদা কেঁদেছিলেন যে, তাঁর আশেপাশের লোকদিগকেও ঘাবড়ে দিয়েছিলেন।

কা'বা ও আরাফাতে গেলে তওবা ক'রে অনুতাপের কান্না কাঁদুন।

শাস্তি ও জাহান্নামের ভয়ে পাপের অনুতাপে নয়নযুগল থেকে যে অশ্রু আসে, তা আসলে প্রাণ-নিংড়ানো অশ্রু। কবি বলেছেন,

وليس الذي يجري من العين ماؤها .... ولكنها روحي تسيل فتقطر

অর্থাৎ, চোখ দিয়ে যা প্রবাহিত হয়, তা তার পানি নয়; বরং তা আমার প্রাণ গলে বয়ে ফোঁটা হয়ে পড়ছে।

৭। মরণকে স্মরণ ক'রে মন্দ পরিণামের ভয়ে কান্না করুন।

ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ সামূদ জাতির বাসস্থান হিজ্‌র (নামক) স্থানে পৌঁছে নিজ সাহাবীদেরকে বললেন, "তোমরা এ সকল শাস্তিপ্রাপ্তদের স্থানে প্রবেশ করলে কাঁদতে কাঁদতে (প্রবেশ) কর। যদি না কাঁদ, তাহলে তাদের স্থানে প্রবেশ করো না। যেন তাদের মতো তোমাদের উপরেও শাস্তি না পৌঁছে যায়।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, ইবনে উমার ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হিজ্‌র অতিক্রম করার সময় বললেন, "তোমরা সেই লোকদের বাসস্থানে প্রবেশ করো না, যারা নিজেদের আত্মার প্রতি অত্যাচার করেছে। যেন তাদের মত তোমাদের উপরেও আযাব না পৌঁছে। কিন্তু কান্না অবস্থায় প্রবেশ করতে পার।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ মাথা ঢেকে নিলেন এবং দ্রুত গতিতে উপত্যকা পার হয়ে গেলেন।

৮। কবর যিয়ারতে যান। সেখানে গিয়ে ভেবে দেখুন কবরবাসীর অবস্থা। আপনাকেও একদিন আসতে হবে এই জায়গায়। আপনি সে কথা মুখেও বলেন, কিন্তু হয়তো তার অর্থ জানেন না। তাই কান্না আসে না। অর্থ

জেনে বলুন, কান্না আসবে।

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَ إِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلاَحِقُوْنَ، نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ.

অর্থ- তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, হে কবরবাসী মুমিন ও মুসলিমগণ! আমরাও---আল্লাহ যদি চান---তোমাদের সঙ্গে অবশ্যই মিলিত হব। আল্লাহর নিকট আমাদের ও তোমাদের জন্য নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। *(মুসলিম ২/৬৭১)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। শোনো! এখন তোমরা যিয়ারত করতে পার। কারণ, কবর যিয়ারত হৃদয় নম্র করে, চক্ষু অশ্রুসিক্ত করে এবং পরকাল স্মরণ করিয়ে দেয়। তবে (যিয়ারতে গিয়ে) বাজে কথা বলো না।" *(হাকেম ১/৩৭৬, আহমাদ ৩/২৩৭-২৫০)*

তৃতীয় খলীফা সাহাবী উযমান ؓ যখন কোন কবরের পাশে দাঁড়াতেন তখন এত কাঁদা কাঁদতেন যে, চোখের পানিতে তাঁর দাড়ি ভিজে যেত। কেউ তাঁকে বলল, 'জান্নাত ও জাহান্নামের আলোচনাকালে আপনি তো কাঁদেন না, আর এই কবর দেখে এত কাঁদছেন?' উত্তরে তিনি বললেন, যেহেতু আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "পরকালের (পথের) মঞ্জিলসমূহের প্রথম মঞ্জিল হল কবর। সুতরাং যে ব্যক্তি এ মঞ্জিলে নিরাপত্তা লাভ করে, তার জন্য পরবর্তী মঞ্জিলসমূহ অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে যায়। আর যদি সে এখানে নিরাপত্তা লাভ না করতে পারে, তবে তার পরবর্তী মঞ্জিলগুলো আরো কঠিনতর হয়।"

আর তিনি একথাও বলেছেন যে, "আমি যত দৃশ্যই দেখেছি, সে সবের চেয়ে অধিক বিভীষিকাময় হল কবর!" *(সহীহ তিরমিযী ১৮৭৮, ইবনে মাজাহ ৪২৬৭ নং)*

৯। পরহেযগার উলামার হৃদয়গ্রাহী ওয়ায শুনুন। তাতে আপনার কান্না আসবে। যেমন সাহাবাগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওয়ায শুনে কাঁদতেন। *(আবূ দাউদ ৪৬০৭, তিরমিযী ২৬৭৬)*

১০। বিপদে-আপদে কাঁদুন। কিন্তু আল্লাহর কাছে সওয়াব ও ক্ষমা

কামনা ক'রে। অভিযোগ ক'রে নয়। ভাইজান! অনেক দুর্ভাগার জীবন যেন একটি পিঁয়াজের মতো। একটির পর একটি কেবল খোসা। আর তার ঝাঁঝে চোখে থাকে অশ্রুধারা। কবি বলেছেন,

'চোখের জলে হয় না কোন রঙ,
তবু কত রঙের ছবি আছে আঁকা।'

চোখের পানি সাদা হলেও বহু রঙ দিয়ে জীবনের ইতিহাস লেখা হয়। অশ্রুবিন্দু বলা হলেও তা কিন্তু বিন্দু নয়, বরং সিন্ধু। এই জন্য একজন নাবিককে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, তার জীবনে সবচেয়ে কোন্ সমুদ্র বড় সমুদ্র বলে মনে হয়েছে? প্রত্যুত্তরে নাবিক বলেছিল, 'চোখের পানি।'

হ্যাঁ, কষ্ট এমন জিনিস, সেটা কষ্ট ক'রে বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখা গেলেও, চোখের মধ্যে লুকিয়ে রাখা যায় না। চোখের পানিতেই বুঝিয়ে দেয় ভিতরের অব্যক্ত কষ্টের কথা।

ভাইজান! চোখের পানি দিয়ে আইনের কাগজের লেখা মুছা যায় না। বিপদ আসার পরে চোখের পানি দিয়ে তা থামানো যায় না। কিন্তু চোখের পানি দিয়ে ভাগ্যলিপির কালি মুছে দেওয়া যায়। বিশ্বাস করুন, আপনার তকদীরও বদলে যায় অশ্রুর আবেদন দিয়ে।

মহানবী ﷺ বলেন, "দুআ ছাড়া অন্য কিছু তকদীর খণ্ডন করে না এবং সৎকাজ ছাড়া অন্য কিছু আয়ু বৃদ্ধি করে না।" *(তিরমিযী)*

আর তার জন্যই তো বিতরের কুনূতে আমরা দুআ ক'রে থাকি,

...وَقِنِيْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ ، فَإِنَّكَ تَقْضِيْ وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ...

অর্থাৎ, ...আমার ভাগ্যে তুমি যা ফায়সালা করেছ, তার মন্দ থেকে রক্ষা কর। কারণ তুমিই ফায়সালা ক'রে থাক এবং তোমার উপর কারো ফায়সালা চলে না।....

সুতরাং বিপদে কাঁদলে আল্লাহর কাছে কাঁদুন, আঘাতে কাঁদলে তাঁরই কাছে চোখের পানি ফেলুন। তিনিই আপনার চোখের পানির কদর করবেন।

কান্না না আসার কারণ

অনেক মানুষের চেষ্টা সত্ত্বেও কান্না আসে না, কান্নার তুফান মনের দেওয়ালে ধাক্কা মারা সত্ত্বেও ভাঙ্গতে পারে না। তারা যে কান্না সামলে নেয়, তা নয়। বরং তাদের কান্না আসেই না। চোখ দিয়ে এক বিন্দুও অশ্রু ঝরে না তাদের। তাদের মনের জমি যেন মরুভূমি, হৃদয়ের আকাশ যেন মেঘ-বর্ষাহীন।

তাদের অনেকে হয়তো কোন আত্মীয়-বিয়োগ হলে কাঁদে, কিন্তু আল্লাহর ভয়ে কাঁদে না।

কিন্তু তার কারণ কী?

সমীক্ষা ক'রে দেখলে দেখা যাবে, চোখে পানি না আসার একাধিক কারণ রয়েছে। তার মধ্যে প্রথম কারণ হল অবিশ্বাস, সন্দেহ ও কপটতা। বলা বাহুল্য, যাদের মনে কুফরী বা মুনাফিকী আছে, তারা আল্লাহর ভয়ে কাঁদবেই না।

এরা পরকালে কাঁদবে খুব বেশি, ইহকালে হাসবে---তবে বেশি নয়। মহান আল্লাহ বলেছেন,

[فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلاً وَلْيَبْكُواْ كَثِيرًا جَزَاء بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ] (٨٢) التوبة

অর্থাৎ, অতএব তারা (দুনিয়াতে) অল্প হাসি হাসুক, আর (আখেরাতে) অনেক কাঁদা কাঁদতে থাকুক, সেই কাজের প্রতিফল স্বরূপ যা তারা করত। *(তাওবাহ ঃ ৮২)*

জাহান্নামে জাহান্নামীরা কেঁদে এত অশ্রু ঝরাবে যে, তাতে নদী প্রবাহিত হবে এবং তার উপর নৌকা চলাও সম্ভব হবে। তারা রক্তের অশ্রুও ঝরাবে। *(সঃ জামে' ২০৩২নং)*

দ্বিতীয়তঃ যারা মু'মিন বা বিশ্বাসী, তাদের না কাঁদার কারণ হল হৃদয়ের কঠিনতা।

চক্ষু হৃদয়ের অনুসারী। হৃদয় কোমল হলে চোখে অশ্রু আসে। হৃদয়

শক্ত হলে চক্ষু শুষ্ক থাকে। সুতরাং সর্বনাশ কঠিন হৃদয়-ওয়ালাদের! মহান আল্লাহ বলেন,

[أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ] (٢٢) سورة الزمر

অর্থাৎ, আল্লাহ ইসলামের জন্য যার বক্ষ উন্মুক্ত ক'রে দিয়েছেন ফলে সে তার প্রতিপালক হতে (আগত) আলোর মধ্যে আছে, সে কি তার সমান---যে এরূপ নয়? দুর্ভোগ তাদের জন্য, যাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণে কঠিন, ওরাই স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে। *(যুমার ঃ ২২)*

আহলে কিতাব (ইয়াহুদী-খ্রিষ্টান) সম্বন্ধে তিনি বলেছেন,

[ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ] (٧٤) سورة البقرة

অর্থাৎ, এর পরও তোমাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গেল; তা পাষাণ কিংবা তার থেকেও কঠিনতর, কিছু পাথর এমন আছে যে, তা থেকে নদী-নালা প্রবাহিত হয় এবং কিছু পাথর এমন আছে যে, বিদীর্ণ হওয়ার পর তা থেকে পানি নির্গত হয়। আবার কিছু পাথর এমন আছে, যা আল্লাহর ভয়ে ধসে পড়ে। বস্তুতঃ তোমরা যা কর, সে সম্বন্ধে আল্লাহ উদাসীন নন। *(বাক্বারাহ ঃ ৭৪)*

মুসলিমদেরকে সম্বোধন ক'রে তিনি বলছেন,

[أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ] (١٦) سورة الحديد

অর্থাৎ, যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে তাদের সময় কি আসেনি যে, আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে তাতে তাদের হৃদয় ভক্তি-

বিগলিত হবে? এবং পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তাদের মতো তারা হবে না? বহুকাল অতিক্রান্ত হয়ে গেলে যাদের অন্তর কঠিন হয়ে পড়েছিল। আর তাদের অধিকাংশই সত্যত্যাগী। *(হাদীদঃ ১৬)*

যে হৃদয়ে কোমলতা নেই, সে হৃদয়ে মঙ্গল নেই। এই জন্য মহানবী ﷺ এমন হৃদয় থেকে পানাহ চাইতেন। তিনি বলতেন,

اَللّٰهُمَّ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَّ يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لاَّ يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لاَّ تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لاَّ يُسْتَجَابُ لَهَا.

অর্থঃ- হে আল্লাহ আমি তোমার নিকট সেই ইল্‌ম থেকে পানাহ চাচ্ছি, যা কোন উপকারে আসে না। সেই হৃদয় থেকে পানাহ চাচ্ছি, যা বিনম্র হয় না। সেই আত্মা থেকে পানাহ চাচ্ছি, যা তৃপ্ত হয় না এবং সেই দুআ থেকে পানাহ চাচ্ছি , যা কবুল হয় না। *(মুসলিম ৭০৮-১, প্রমুখ)*

বলাই বাহুল্য যে, হৃদয় কোমল হলে তবেই চক্ষু হতে অশ্রুপাত হবে। যেহেতু হৃদয়ই সর্বাঙ্গের রাজা। রাজা ভাল হলে প্রজারা তার অনুসারী হবে। রসূল ﷺ বলেন, "জেনে রাখ, দেহের মধ্যে এমন এক মাংস-পিন্ড আছে, যা ভালো হলে সারা দেহ ভালো হবে। আর তা খারাপ হলে সারা দেহ খারাপ হবে। শোন! তাহল হৃৎপিন্ড (অন্তর)।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

হৃদয় কঠিন হওয়ার কারণসমূহ

হৃদয় কঠিন হওয়ার নানা কারণ আছে, যেমন হৃদয় নরম হওয়ারও বিভিন্ন কারণ আছে। সুতরাং কঠিন হওয়ার কারণ দূর ক'রে যদি নরম হওয়ার কারণ অবলম্বন করা হয়, তাহলে উদ্দেশ্য সফল হতে পারে।

যে সকল কারণে হৃদয় কঠিন হয়, তা নিম্নরূপ ঃ-

১। বেশি কথা বলা।

ইসলামী নীতি হল মুসলিম কথা বলবে অল্প। মহানবী ﷺ বলেন,

"তোমাদের মধ্যে আমার নিকট অধিক প্রিয়তম ও কিয়ামতের দিন আমার সবচেয়ে নিকটে অবস্থানকারী সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের মধ্যে সদাচরণে সবচেয়ে উত্তম। তোমাদের মধ্যে আমার নিকট অধিক ঘৃণ্যতম ও কিয়ামতের দিন আমার থেকে সবচেয়ে দূরবর্তী অবস্থানকারী তারা, যারা অতিভাষী গপে, অতিবাদী---যারা অত্যুক্তি দ্বারা অপরকে খোঁচা মেরে থাকে এবং যারা অহংকারের সাথে মুখভর্তি লম্বা লম্বা কথা বলে থাকে।" *(সহীহুল জামে' ২১৯৭নং)*

যারা বেশি কথা বলে তাদের বাজে ও মিথ্যা বকা স্বাভাবিক। সুতরাং তাতে হৃদয়ের কঠিনতা সৃষ্টি হতেই পারে।

ফুযাইল বিন ইয়ায (রঃ) ও বিশ্‌র বিন হারেস (রঃ) বলেছেন, 'দু'টি আচরণ হৃদয়কে কঠিন ক'রে দেয়, বেশি কথা বলা ও বেশি খাওয়া।' *(সিয়ারু আ'লামিন নুবালা' ৮/৪৪, হিল্য়াতুল আওলিয়া ৮/৩৫০)*

বেশি কথা বললে হৃদয় কঠিন হয়ে যায়---এ ব্যাপারে একটি হাদীসও বর্ণিত আছে। কিন্তু সেটি সহীহ নয়।

বেশি কথা বলার পর্যায়ে দ্বীনের বিষয়ে তর্ক-বিতর্কও পড়ে। আর ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, 'দ্বীনের ব্যাপারে তর্ক-বিতর্ক অন্তরকে কঠিন ক'রে দেয় এবং বিদ্বেষ সৃষ্টি করে।' *(সিয়ারু আ'লামিন নুবালা' ১০/২৮)*

২। অধিক খাওয়া

অধিক খাওয়া ও ভোজন-বিলাসে হৃদয় কঠিন হয়ে যায়। যেমন পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

৩। অধিক হাসা

অধিক হাসার ফলে অন্তর মারা যায়। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমরা বেশী বেশী হেসো না। কারণ, বেশী হাসার ফলে হৃদয় মারা যায়।" *(আহমাদ, তিরমিযী, ২৩০৫, ইবনে মাজাহ ৪১৯৩, সহীহুল জামে' ৭৪৩৫নং)*

এক যুবক কোন এক মজলিসে বসে অট্টহাসি হাসছিল। হাসান বাসরী সেদিকে পার হওয়ার সময় তা দেখে তাকে বললেন, 'ওহে যুবক!

পুলসিরাত কি পার হয়ে গেছ?'

সে বলল, 'না।'

তিনি বললেন, 'তাহলে তুমি কি জানো, তুমি জান্নাতে যাবে, না জাহান্নামে?'

সে বলল, 'না।'

তিনি বললেন, 'তাহলে এ হাসি কীসের?'

এর পর থেকে যুবককে আর হাসতে দেখা যায়নি।

হাসান বাসরী বলতেন, 'যে জানে যে, তাকে মরতেই হবে, কিয়ামত অবশ্যই কায়েম হবে এবং মহান আল্লাহর সামনে তাকে দাঁড়াতেই হবে, তার দীর্ঘ দুশ্চিন্তা করাই সমীচীন।' *(হিল্‌য়াতুল আওলিয়া ২/ ১৩৩)*

৪। অধিকাধিক পাপ করা

মহান আল্লাহ বলেন,

[كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ] (١٤) سورة المطففين

অর্থাৎ, না এটা সত্য নয়; বরং তাদের কৃতকর্মই তাদের হৃদয়ে জং ধরিয়ে দিয়েছে। *(মুত্বাফ্‌ফিফীন ঃ ১৪)*

মহানবী ﷺ বলেছেন, "মু'মিন যখন কোন পাপ করে, তখন তার হৃদয়ে একটি কালো দাগ পড়ে যায়। অতঃপর সে যদি তওবা করে, পাপ থেকে বিরত হয় এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাহলে তার হৃদয় পরিষ্কার হয়ে যায়। আর যদি আরো বেশি পাপ করে, তাহলে সেই দাগ তার হৃদয়কে গ্রাস ক'রে নেয়। এই হল সেই জং, যার কথা আল্লাহ তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন।" *(আহমাদ ৭৮৯২, তিরমিযী ৩৩৩৪, সহীহ ইবনে মাজাহ ৩৪২২নং)*

উক্ববাহ ইবনে আমের ﷺ বলেন, আমি নিবেদন করলাম, 'হে আল্লাহর রসূল! কিসে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব?' তিনি বললেন, "তুমি নিজ রসনাকে নিয়ন্ত্রণে রাখ। তোমার ঘর তোমার জন্য প্রশস্ত হোক। (অর্থাৎ, অবসর সময়ে নিজ গৃহে অবস্থান কর।) আর নিজ পাপের জন্য ক্রন্দন কর।" *(তিরমিযী ২৪০৬নং)*

অতি মহাপাপ যেমন, কুফরী, শির্ক, মুনাফিকী, সন্দেহ, গায়রুল্লাহর ভয়, গায়রুল্লাহর উপর ভরসা, খেয়াল-খুশীর অনুসরণ ইত্যাদি এবং মহাপাপ যেমন, অহংকার, কার্পণ্য, কাপুরুষতা, হিংসা, বিদ্বেষ, পদ-লোভ, গদির লোভ, অবৈধ প্রেম-ভালবাসা, পার্থিব প্রেম, অর্থপ্রেম ইত্যাদি মানুষের হৃদয়কে কঠিন ক'রে তোলে। অর্থের মোহ হৃদয়কে অন্ধ ক'রে তোলে। যে হৃদয়ে এই শ্রেণীর পাপ থাকে, সে হৃদয়ের আকাশ থেকে বৃষ্টির আশা করা ভুল। সে হৃদয়-ওয়ালার চক্ষু আল্লাহর ভয়ে অশ্রু-বর্ষণ করতে পারে না।

মাকহূল বলেছেন, 'যার পাপ সবার চেয়ে কম, তার হৃদয় সবার চেয়ে নরম।' *(ইবনে আবিদ দুন্‌য়া ৬৬নং)*

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেছেন, 'নিশ্চয় পুণ্য কাজের ফলে চেহারায় জ্যোতি আসে, হৃদয়ে আলো আসে, রুযীতে বরকত আসে, দেহে শক্তি আসে, সৃষ্টির মনে ভালবাসা আসে। আর পাপ কাজের ফলে চেহারায় কালিমা আসে, হৃদয়ে অন্ধকার আসে, রুযীতে কমতি আসে, দেহে দুর্বলতা আসে, সৃষ্টির মনে বিদ্বেষ আসে।' *(আল-ওয়াবিলুস স্বাইয়িব ১/৪৩)*

পাপের ফলে মনের প্রদীপের কাঁচে কালি পড়ে যায়, মরিচা পড়ে যায়। আরো পাপ করতে থাকলে তার উপর আবরণ চড়ে। তারপরে তার উপর তালা পড়ে যায়। আর সে মন কি কাঁদতে পারে?

৫। কুসঙ্গীর সংসর্গ

নিজে ভাল হলেও অনেক সময় খারাপ বন্ধুর সংসর্গে থেকে হৃদয় নষ্ট হয়ে যায়, চরিত্র ভ্রষ্ট হয়ে যায়। এই জন্য মহানবী ﷺ মন্দ সাথীকে কামারের সাথে তুলনা করেছেন, যার পাশে বসলে কাপড় পুড়ে যায় অথবা খারাপ গন্ধ পাওয়া যায় অথবা ধোঁয়ায় শ্বাসরোধ হওয়ার উপক্রম হয়।

ভ্রষ্ট বন্ধু যে ভাল বন্ধুকেও নষ্ট করে, সে কথা মহান আল্লাহ কুরআনে বলেছেন,

[وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً . يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلاناً خَلِيلاً . لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلإِنْسَانِ خَذُولاً]

﴿الفرقان ٢٧-٢٩﴾

অর্থাৎ, সীমালংঘনকারী সেদিন নিজ হস্তদ্বয় দংশন করতে করতে বলবে, 'হায়! আমি যদি রসূলের সাথে সৎপথ অবলম্বন করতাম। হায় দুর্ভোগ আমার! আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম। আমাকে অবশ্যই সে বিভ্রান্ত করেছিল আমার নিকট কুরআন পৌঁছনোর পর। আর শয়তান তো মানুষকে বিপদকালে পরিত্যাগই করে।' *(ফুরক্বান ঃ ২৭-২৯)*

সঙ্গ-দোষে লোহা ভাসে। অনুরূপ বন্ধু-দোষে চরিত্র নাশে। এই জন্য আবুল আসওয়াদ দুআলী বলেছেন, 'কুসঙ্গী অপেক্ষা নিকৃষ্ট সৃষ্টি আল্লাহ অন্য কিছু সৃষ্টি করেননি।'

ইবনে হিব্বান বলেছেন, 'জ্ঞানী লোক খারাপ লোকেদের সাহচর্য গ্রহণ করে না। কারণ, খারাপ সহচর জাহান্নামের টুকরা। এ সহচর বিদ্বেষ সৃষ্টি করে, তার ভালবাসা সরল হয় না এবং প্রতিশ্রুতি পালন করে না।' *(রাওয়াতুল উক্বালা' ১/১০১)*

সেই হৃদয়ের মানুষের চক্ষু কি অশ্রুপাত করতে পারে, যে অবৈধ নারী-প্রেমে মুগ্ধ থাকে? সে চোখে কি আল্লাহর ভয়ে পানি গড়াতে পারে, যে চোখ অবৈধ রূপ ও নারী-সৌন্দর্য দর্শন ক'রে তৃপ্তি ও আনন্দ উপভোগ করে?

আমাদের হৃদয় কঠিন হওয়ার সাথে সাথে আল্লাহর সাথে আমাদের সত্যনিষ্ঠতা নেই। আমরা আল্লাহকে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করি, তাঁকে ফাঁকি দিয়ে সফলতার স্বপ্ন দেখি। আবূ মুআবিয়া আল-আসওয়াদ বলেছেন, 'আল্লাহর সাথে সত্যনিষ্ঠা যার বেশি আছে, তার চোখ ভিজে থাকে।' *(ইবনে আবিদ দুন্য়া ৭১নং)*

তাছাড়া যার হৃদয়ে ব্যথা নেই, তার চক্ষু কাঁদবে কেন? যার হৃদয়ে প্রেমিকের বিরহ-বেদনা নেই, তার চোখে পানি আসবে কেন? যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ভালবাসে না, তার চোখে আল্লাহর ভয়ে কান্না আসবে

কেন?

সুফিয়ান বিন উয়াইনাহ বলেছেন, 'হৃদয়ে জখম থাকলে চক্ষু সিক্ত থাকে।' *(ঐ ৭২নং)*

মোটকথা, হৃদয় নরম না হলে চোখে পানি আসবে না। অতএব যাঁরা চোখে পানি আনতে চান, তাঁদের কঠিন হৃদয়কে কোমল করা উচিত।

হৃদয় নরম করার উপায়

কতিপয় আমল আছে, তা করলে কঠোর হৃদয়ের মানুষ দেখে, শুনে ও পড়ে নরম হৃদয়ের হয়ে যেতে পারে। আর তার ফলে---আল্লাহর তওফীকে---তার চোখে পানি আসতে পারে। সেই আমলগুলি নিম্নরূপ ঃ-

১। আল্লাহর সুন্দরতম নাম ও গুণাবলী এবং তাঁর কর্মাবলীর জ্ঞান

পূর্বে বলা হয়েছে যে, যে তার সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও রুযীদাতাকে চিনবে, সে তাঁকে ভয় করবে এবং তাঁর কাছে আশা রাখবে। সে তাঁর তরফ থেকে দুঃখের ভয় করবে ও সুখের আশা রাখবে। আর বিপরীত আশঙ্কায় তার বুক বেদনায় টনটন করবে এবং তার চোখ বেয়ে ঝরঝর ক'রে অশ্রু পড়বে।

সুলাইমান দারানী বলেছেন, 'প্রত্যেক জিনিসের প্রতীক আছে। আর আল্লাহর ভালবাসা ও সাহায্য থেকে বঞ্চিত হওয়ার প্রতীক হল আল্লাহর ভয়ে কান্না বর্জন করা।' *(আল-বিদায়াহ অন্নিহায়াহ ১০/২৫৬)*

সুতরাং আল্লাহ যখন বান্দাকে তাঁর ভালবাসা ও সাহায্য থেকে বঞ্চিত করেন, তখন বান্দার হৃদয় কঠোর হয়ে যায় এবং তার চোখে পানি আসে না।

প্রেমিক প্রেমিকের সাথে সাক্ষাতের আশায় কান্না করে, তার বিরহের

ভয়ে কান্না করে। সুতরাং বান্দা যদি আল্লাহকে ভালবাসে, তাহলে সে তাঁর সাক্ষাতের আগ্রহে কান্না করবে, তাঁর শাস্তির ভয়ে কান্না করবে এবং তাঁর সন্তুষ্টি ও পুরস্কারের আশায় কান্না করবে।

এই তো সেই যিক্‌রকারী বান্দা, যে হৃদয়ে ভয়, ভালবাসা ও আশা রেখে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ ক'রে অশ্রু বিসর্জন করে। এই বান্দাই তো তাঁর আরশের নিচে ছায়া পাবে।

আল্লাহর শাস্তি, আযাব ও জাহান্নামকে ভয় করা, আল্লাহকে ভয় করার পর্যায়ভুক্ত। যেমন আমল কবুল না হওয়ার ভয়ও সেই শ্রেণীর ভয়। মহান আল্লাহ বলেন,

[وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ] (٦٠)

অর্থাৎ, যারা তাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে, এই বিশ্বাসে তাদের যা দান করবার তা দান করে ভীত-কম্পিত হৃদয়ে। *(মু'মিনূন ঃ ৬০)*

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) আল্লাহর রসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ (ভীত-কম্পিত) কি সেই ব্যক্তি, যে ব্যভিচার করে, চুরি করে ও মদ পান করে?' উত্তরে তিনি বললেন, "না, হে সিদ্দীকের বেটি! সে হল সেই ব্যক্তি, যে রোযা রাখে, দান করে ও নামায পড়ে, কিন্তু ভয় করে যে, তা হয়তো কবুল হবে না।" *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, হাকেম)*

২। অর্থ বুঝে কুরআন পাঠ

অর্থ বুঝে কুরআন তিলাঅত করলে হৃদয় নরম হতে বাধ্য। যেহেতু কুরআনে রয়েছে নানা ইতিহাস, আদেশ ও উপদেশ। তাছাড়া আল্লাহর কিতাব পাঠ ক'রে নরম হওয়া মু'মিন বান্দাদের খাস গুণ। মহান আল্লাহ বলেছেন,

[إِنَّ الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ سُجَّدًا . وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولاً . وَيَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا] ﴿ الإسراء ١٠٧-١٠٩: ﴾

অর্থাৎ, যাদেরকে এর পূর্বে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তাদের নিকট যখন এটা পাঠ করা হয়, তখনই তারা চেহারা লুটিয়ে সিজদায় পড়ে এবং বলে, আমাদের প্রতিপালক পবিত্র, মহান! অবশ্যই আমাদের প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি কার্যকর হয়েই থাকে। আর তারা কাঁদতে কাঁদতে ভূমিতে লুটিয়ে (সিজদা) দেয় এবং এ (কুরআন) তাদের বিনয় বৃদ্ধি করে।' *(বানী ইস্রাঈল ঃ ১০৭-১০৯)*

এক রাত্রে মুহাম্মাদ বিন মুনকাদির কাঁদতে লাগলেন। তাঁর বাড়ির লোক জমা হয়ে তাঁর কান্নার কারণ জানতে চাইল। কিন্তু কান্নায় তাঁর জিহ্বা আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল, কিছু বলতে পারলেন না। তাই তারা আবূ হাযেমকে ডেকে পাঠাল। তিনি এসে তাঁকে কিছু পরিমাণ ক্ষান্ত ক'রে কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। মুহাম্মাদ বললেন, 'আমি নামাযে আল্লাহর এই বাণী পাঠ করলাম তাই,

[وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِن سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ] (٤٧) الزمر

অর্থাৎ, যারা সীমালংঘন করেছে; যদি তাদের পৃথিবীর সমস্ত কিছু এবং তার সাথে সমপরিমাণ আরও কিছু থাকত, তাহলে কিয়ামতের দিন নিকৃষ্ট শাস্তি হতে মুক্তির জন্য পণ স্বরূপ তা প্রদান করত। তাদের সামনে আল্লাহর নিকট হতে এমন কিছু প্রকাশ হবে, যা ওরা কল্পনাও করেনি। *(যুমার ঃ ৪৭)*

এ কথা শুনে আবূ হাযেমও কাঁদতে লাগলেন। মুহাম্মাদ বিন মুনকাদিরও পুনরায় কাঁদতে শুরু করলেন। বাড়ির লোকেরা বলল, 'আমরা আপনাকে উনার কান্না বন্ধ করার জন্য ডেকে পাঠালাম, আর

আপনি উনার কান্না আরো বাড়িয়ে দিলেন!' *(সিয়ারু আ'লামিন নুবালা' ৫/৩৫৫)*

৩। হৃদয়-গলানো বক্তাদের ওয়ায-নসীহত শোনা।

৪। রোগী দেখতে যাওয়া।

৫। মরণাপন্ন রোগীর জান কবয দর্শন করা।

৬। লাশ গোয়ানো ও কাফনানো দেখা ও জানাযার নামাযে ও দাফনকার্যে অংশগ্রহণ করা।

৭। নিজের জন্য কাফন প্রস্তুত রাখা।

সাহাবাগণের অনেকেই নিজের কাফন নিজেই প্রস্তুত ক'রে রেখেছিলেন। *(বুখারী)* খাব্বাব ﷺ নিজের কাফন দেখে কাঁদতেন। *(হিলয়াতুল আউলিয়া ১/১৪৫)*

৮। কবর যিয়ারত করা।

৯। মৃত্যু ও কবর বিষয়ক গজল শোনা।

১০। নবী ﷺ ও দরিদ্র সাহাবা ﷺ-দের অভাব-অনটনের জীবনী পড়া।

১১। এতীম, মিসকীন ও অভাবী লোকেদের অভাব-অভিযোগ শোনা।

১২। নরম মনের মানুষদের সাথে উঠা-বসা করা।

১৩। তাহাজ্জুদের নামায পড়া।

১৪। আল্লাহর কাছে বেশি বেশি দুআ করা।

দুই শ্রেণীর মানুষের রাত্রি অতিবাহিত হয়, সফল ও বিফলদের। আরবী কবি বলেন,

ليل المحرومين غناء ومكاء ... وليل الصالحين دعاء وبكاء.

ليل المحرومين مجون وخنوع ... وليل الصالحين ذكر ودموع.

অর্থাৎ, বঞ্চিতদের রাত্রি গান ও শিস দ্বারা পরিপূর্ণ, আর নেক লোকেদের রাত্রি কান্না ও দুআ দ্বারা পরিপূর্ণ।

বঞ্চিতদের রাত্রি ধৃষ্টতা ও নীচতা দ্বারা পরিপূর্ণ, আর নেক লোকেদের রাত্রি যিক্র ও অশ্রু দ্বারা পরিপূর্ণ।

চোখে পানি আসে না, যেহেতু দুনিয়ার আনন্দ নিয়ে মেতে আছে মানুষ। পার্থিব সুখ-সম্ভোগ নিয়ে মত্ত থাকলে কাঁদার সময়ই তো আসে না।

অনেকে বলে, 'আমার সব আছে, কী চাইব? কেন কাঁদব?'

কিন্তু যা আছে, তা থাকবে তো? আল্লাহ কেড়ে নেবেন না তো? এমন বক্তা কি কবরের আযাব থেকে পরিত্রাণের সার্টিফিকেট পেয়ে গেছে? জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্তিলাভের নিশ্চয়তা পেয়ে গেছে?

আসলে যাদের হৃদয়ে 'রহমত' নেই, তারা সেই করুণা, কোমলতা ও মায়া-মমতা থেকে বঞ্চিত।

"দুর্ভাগা ছাড়া অন্য কারো (হৃদয়) থেকে দয়া, ছিনিয়ে নেওয়া হয় না।" *(আহমাদ, ২/৩০১, আবূ দাঊদ ৪৯৪২, তিরমিযী, ইবনে হিব্বান, সহীহুল জামে' ৭৪৬৭নং)*

যাদের হৃদয়ে অপরের প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্য ও সহানুভূতি-সহমর্মিতা নেই, তারা কি আদৌ কাঁদতে পারে?

আজ উম্মাহ শতধাবিচ্ছিন্ন, অত্যাচারিত, নিপীড়িত, নিষ্পিষ্ট, অবহেলিত, পদদলিত, বঞ্চিত, লাঞ্ছিত, শোকাহত। তবুও কি কান্না আসে না?

উম্মাহর গৌরব আজ লুণ্ঠিত, ধূলাধূসরিত। তবুও কি চোখে পানি আসে না?

আজ সকল বিজাতি উম্মাহর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, যেমন ভোজনকারীরা ভোজপাত্রের উপর একত্রিত হয়। তবুও কি চক্ষু অশ্রুসজল হয় না?

কত শত নিরপরাধ মানুষের রক্ত প্রবাহিত দেখেও কি চক্ষুতে অশ্রু প্রবাহিত হয় না?

তবুও বলি, এ সব তো আল্লাহর ইচ্ছা। আমরা তকদীরকে বিশ্বাস করি।

আমরা জানি, সবেই আমাদের কল্যাণ আছে।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "মুমিনের ব্যাপারটাই আশ্চর্যজনক। তার প্রতিটি কাজে তার জন্য মঙ্গল রয়েছে। এটা মু'মিন ব্যতীত অন্য কারো জন্য নয়। সুতরাং তার সুখ এলে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। ফলে এটা তার জন্য মঙ্গলময় হয়। আর দুঃখ পৌঁছলে সে ধৈর্য ধারণ করে। ফলে এটাও তার জন্য মঙ্গলময় হয়।" *(মুসলিম)*

তবে তার সাথে পরিবর্তনের প্রচেষ্টা চাই। মহান আল্লাহ বলেন,

[إِنَّ اللهَّ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللهُّ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلاَ مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ] (١١) سورة الرعد

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না; যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা নিজেরা পরিবর্তন করে। আর কোন সম্প্রদায়ের সম্পর্কে যদি আল্লাহ অশুভ কিছু ইচ্ছা করেন, তাহলে তা রদ করবার কেউ নেই এবং তিনি ছাড়া তাদের কোন অভিভাবক নেই। *(রা'দঃ ১১)*

[ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَّ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللهَّ سَمِيعٌ عَلِيمٌ] (٥٣) سورة الأنفال

অর্থাৎ,এ এজন্য যে, আল্লাহ কোন সম্প্রদায়কে যে সম্পদ দান করেন, তিনি তা (ধ্বংস দিয়ে) পরিবর্তন করেন না; যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে। আর নিশ্চিত আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। *(আনফাল ঃ ৫৩)*

কান্নার চেষ্টা করা

অনেকের কান্না আসে না। হৃদয় কঠিন হওয়ার কারণে তাদের চোখে পানি বের হতে চায় না। তখন তারা কান্নার ভান করে, কাঁদো কাঁদো মুখ করে। জোর ক'রে কাঁদতে চায়, অথচ চোখে পানি আসে না।

এমন কান্না দু' প্রকার ঃ প্রশংসনীয় ও নিন্দনীয়।

প্রশংসনীয় হবে তখন, যখন আল্লাহর ভয়ে হৃদয়কে নরম ক'রে কাঁদার

চেষ্টা করা হবে। পরন্তু তাতে 'রিয়া' বা লোকপ্রদর্শনের উদ্দেশ্য থাকবে না। মানুষের কাছে সুনাম বা প্রশংসা নেওয়ার নিয়ত থাকবে না।

আর নিন্দনীয় হবে তখন, যখন 'রিয়া' ও লোকপ্রদর্শন উদ্দেশ্য হবে।

বদর যুদ্ধে ৭০ জন কাফের মারা পড়ল এবং ৭০ জন বন্দী হল। এটা কাফের ও মুসলিমদের প্রথম যুদ্ধ ছিল। এই জন্য যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে কী ধরনের আচরণ করা যেতে পারে এ ব্যাপারে পূর্ণরূপে কোন বিধান স্পষ্ট ছিল না। সুতরাং নবী ﷺ সেই ৭০ জন বন্দীদের ব্যাপারে সাহাবাদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন যে, কী করা যাবে? তাদেরকে হত্যা করা হবে, না কিছু মুক্তিপণ (বিনিময়) নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হবে? বৈধতা হিসাবে এই দু'টি রায়ই সঠিক ছিল। সেই জন্য উক্ত দু'টি রায় নিয়ে বিবেক-বিবেচনা ও চিন্তা-ভাবনা করতে লাগলেন। কিন্তু কখনো কখনো বৈধতা ও অবৈধতা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে কাল-পাত্র ও পরিস্থিতি বুঝে অধিকতর উত্তম পন্থা অবলম্বন করার প্রয়োজন হয়। এখানেও অধিকতর কল্যাণকর পন্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু বৈধতাকে সামনে রেখে অপেক্ষাকৃত কমতর কল্যাণকর পন্থা অবলম্বন করা হল। যে ব্যাপারে সতর্ক করে আল্লাহ তাআলার তরফ হতে ভর্ৎসনাস্বরূপ আয়াত অবতীর্ণ হল। উমার ؓ প্রভৃতিগণ নবী ﷺ-কে এই পরামর্শ দিলেন যে, কুফরের শক্তি ও প্রতাপকে ভেঙ্গে ফেলা দরকার আছে। এই জন্য বন্দীদেরকে হত্যা করা হোক। কেননা, এরা হল কুফ্র ও কাফেরদের প্রধান ও সম্মানিত ব্যক্তি। এরা মুক্তি পেলে ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে অধিকরূপে চক্রান্ত চালাবে। পক্ষান্তরে আবু বাক্র ؓ প্রভৃতিগণ উমার ؓ-এর রায়ের বিপরীত রায় পেশ করলেন যে, তাদের কাছ থেকে মুক্তিপণ (বিনিময়) নিয়ে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হোক। আর ঐ মাল দ্বারা আগামী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হোক। নবী ﷺ এই রায়কে প্রাধান্য দিলেন। তখন এ ব্যাপারে আয়াত অবতীর্ণ হল,

[مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٦٧) لَوْلا كِتَابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ] (٦٨) الأنفال

অর্থাৎ, দেশে সম্পূর্ণভাবে শত্রু নিপাত না করা পর্যন্ত বন্দী রাখা কোন নবীর জন্য সঙ্গত নয়। তোমরা কামনা কর পার্থিব সম্পদ এবং আল্লাহ চান পরলোকের কল্যাণ। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আল্লাহর পূর্ব বিধান (লিপিবদ্ধ) না থাকলে তোমরা যা গ্রহণ করেছ, তার জন্য তোমাদের উপর মহাশাস্তি আপতিত হত। *(আনফাল ঃ ৬৭-৬৮, আহসানুল বায়ান)*

পরবর্তীতে নবী ﷺ-এর কাছে এলেন এবং দেখলেন, তিনি ও তাঁর সাথে আবূ বাক্র কাঁদছেন। উমার বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! কীসের জন্য কাঁদছেন, আমাকে বলুন। পারলে আমিও কাঁদব। আর না পারলে আপনাদের দু'জনের কান্নার কারণে আমি কান্নার ভান করব।' *(মুসলিম)*

উমারের এ কথা শুনে নবী ﷺ কোন আপত্তি করেননি। আর তার মানে তা নিন্দনীয় নয়।

আব্দুল্লাহ বিন আম্র ﷺ বলেন, 'তোমরা কাঁদ। কাঁদতে না পারলে কাঁদার ভান কর। তোমরা যদি সঠিক খবর জানতে, তাহলে তোমাদের প্রত্যেকে ততক্ষণ নামায পড়ত, যতক্ষণ পিঠ ভেঙ্গে না গেছে এবং ততক্ষণ কাঁদত, যতক্ষণ স্বর ভেঙ্গে না গেছে!' *(হাকেম, সহীহ তারগীব ৩৩২৮-নং)*

আমার নবী কাঁদতেন

আগেও বলা হয়েছে, আমাদের দুই জাহানের সর্দার ﷺ কাঁদতেন। অবশ্য তাঁর কান্না ছিল তাঁর হাসির মতোই। অর্থাৎ, তিনি উচ্চ রবে কাঁদতেন না, যেমন অট্টহাসি হাসতেন না। কান্নার সময় তাঁর দুই চক্ষু বেয়ে অশ্রুধারা প্রবাহিত হত। কখনো কখনো তাঁর বুকের ভিতর থেকে

অস্ফুট কান্নার আওয়াজ আসত।

তিনি কখনো কোন মৃতব্যক্তির প্রতি শোকার্ত হয়ে কেঁদেছেন। কখনো নিজ উম্মতের প্রতি মায়া ও দয়াবশতঃ কান্না করেছেন। কখনো আল্লাহর ভয়ে কেঁদেছেন। কখনো কুরআন শুনে তাঁর চোখে পানি এসেছে। আর সে পানি হল ভয়যুক্ত ভক্তি ও ভালবাসায় কান্নার ফলশ্রুতি। *(যাদুল মাআদ ১/১৭৫)*

আলী ﷺ বলেন, বদর যুদ্ধের দিন মিক্বদাদ ছাড়া অন্য কেউ অশ্বারোহী ছিল না। রাত্রে আমাদের সকলেই ঘুমিয়ে ছিল। কেবল আল্লাহর রসূল ﷺ ফজর পর্যন্ত গাছের নিচে নামায পড়ে কাঁদছিলেন। *(সহীহ তারগীব ৩/১৬৩)*

আনাস ﷺ বলেন, 'নবী ﷺ এর এক কন্যা (উম্মে কুলষূম)এর দাফন কার্যের সময় আমি উপস্থিত ছিলাম। দেখলাম, আল্লাহর রসূল ﷺ কবরের পাশে বসে আছেন। আর তাঁর চোখ দু'টি অশ্রুসিক্ত ছিল। অতঃপর (লাশ নামানোর সময়) তিনি বললেন, "তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে (গত) রাত্রে স্ত্রী সহবাস করেনি?" আবু তালহা বললেন, 'আমি আছি, হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "তাহলে তুমি ওর কবরে নামো।" এ শুনে আবূ তালহা কবরে নামলেন। *(বুখারী ১২৮৫নং, হাকেম ৪/৪৭, বাইহাকী ৪/৫৩, আহমাদ ৩/১২৬ প্রমুখ)*

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ﷺ বলেন, সা'দ ইবনে উবাদাহ ﷺ একবার পীড়িত হলে আব্দুর রহমান ইবনে আওফ, সা'দ ইবনে আবী অক্কাস এবং আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ ﷺদের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নিকট কুশল জিজ্ঞাসার জন্য গেলেন। যখন তিনি তাঁর নিকট উপস্থিত হলেন, তখন তাঁকে অজ্ঞান অবস্থায় পেলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ও কি মারা গেছে? লোকেরা জবাব দিল, হে আল্লাহর রসূল! না (মারা যায়নি)। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ কেঁদে ফেললেন। সুতরাং লোকেরা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কান্না করতে দেখল, তখন তারাও কাঁদতে লাগল। তিনি বললেন, "তোমরা কি শুনতে পাও না? নিঃসন্দেহে আল্লাহ চোখের অশ্রু ঝরাবার জন্য শাস্তি দেন না এবং আন্তরিক দুঃখ প্রকাশের জন্যও শাস্তি দেন না।

কিন্তু তিনি তো এটার কারণে শাস্তি দেন অথবা দয়া করেন।” এই বলে তিনি নিজ জিভের প্রতি ইঙ্গিত করলেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

উসামাহ رضي الله عنه বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট তাঁর নাতিকে তার মুমূর্ষ অবস্থায় আনা হল। (ওকে দেখে) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চক্ষুদ্বয় হতে অশ্রু ঝরতে লাগল। সা'দ বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! এ কী?' তিনি বললেন, “এটা রহমত (দয়া); যা আল্লাহ তাঁর বান্দাদের অন্তরে রেখেছেন। আর আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে দয়ালুদের প্রতিই দয়া করেন।” *(বুখারী ও মুসলিম)*

আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পুত্র ইব্রাহীমের নিকট গেলেন, যখন সে মারা যাচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দু'চোখ দিয়ে অশ্রুপাত হতে লাগল। আব্দুর রহমান ইবনে আওফ তাঁকে বললেন, 'আপনিও (কাঁদছেন)? হে আল্লাহর রসূল!' তিনি ﷺ বললেন, “হে আওফের পুত্র! এটা দয়া।” অতঃপর দ্বিতীয়বার কেঁদে ফেললেন। তারপর বললেন, “চোখ অশ্রুপাত করছে এবং অন্তর দুঃখিত হচ্ছে। আমরা সে কথাই বলব, যা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করবে। আর হে ইব্রাহীম! আমরা তোমার বিরহে দুঃখিত।” *(বুখারী, মুসলিম কিছু অংশ)*

বারা' বিন আযেব رضي الله عنه বলেন, একদা আমরা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সাথে ছিলাম। হঠাৎ তিনি একদল লোক দেখতে পেয়ে বললেন, “কী ব্যাপারে ওরা জমায়েত হয়েছে?” কেউ বলল, 'একজনের কবর খোঁড়ার জন্য জমায়েত হয়েছে।' একথা শুনে আল্লাহর রসূল ﷺ ঘাবড়ে উঠলেন। তিনি তড়িঘড়ি সঙ্গীদের ত্যাগ করে কবরের নিকট পৌঁছে হাঁটু গেড়ে বসে গেলেন। তিনি কী করছেন তা দেখার জন্য আমি তাঁর সামনে খাড়া হলাম। দেখলাম, তিনি কাঁদছেন। পরিশেষে তিনি এত কাঁদলেন যে, তার চোখের পানিতে মাটি পর্যন্ত ভিজে গেল। অতঃপর তিনি আমাদের দিকে মুখ তুলে বললেন, “হে আমার ভাই সকল! এমন দিনের জন্য তোমরা প্রস্তুতি নাও।” *(বুখারী, তারীখ, ইবনে মাজাহ ৪১৯৫, আহমাদ ৪/৩৯৪, সিলসিলাহ সহীহাহ ১৭৫১ নং)*

ইবনে মাসঊদ رضي الله عنه বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, “তুমি আমার সামনে কুরআন তিলাঅত কর।” উত্তরে আমি আরজ করলাম,

'আমি আপনার সামনে তিলাঅত করব, অথচ তা আপনার উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে?' তিনি বললেন, “আমি অন্যের কাছ থেকে তা শুনতে ভালবাসি।” অতএব আমি সূরা 'নিসা' তিলাঅত করলাম। পরিশেষে যখন আমি এ আয়াতে এসে পৌঁছলাম; যার অর্থ, “তখন তাদের কী অবস্থা হবে, যখন প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে একজন সাক্ষী (নবী) উপস্থিত করব এবং তোমাকেও তাদের সাক্ষীরূপে উপস্থিত করব?” তখন তিনি আমাকে বললেন, “যথেষ্ট, এবার থাম।” আমি তাকিয়ে দেখলাম, তাঁর দু'চোখ থেকে আশ্রুধারা প্রবাহিত হচ্ছে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

এ আয়াত শুনে তিনি কাঁদলেন। কারণ, তিনি কিয়ামতের ভয়াবহতার কথা স্মরণ করলেন। সেখানে সকল মানুষের জন্য সাক্ষ্য দিতে হবে, সকলের জন্য সুপারিশ করতে হবে ইত্যাদি কথা মনে ক'রে তাঁর চক্ষু অশ্রুতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল।

সলফে স্বালেহীনের কান্না বিষয়ক বাণী ও নমুনা

সাহাবায়ে কিরাম আল্লাহর ভয়ে বেশি বেশি কান্না করতেন। যেহেতু তাঁরা তা শিখেছিলেন তাঁদের আদর্শ মহানবী ﷺ-এর নিকট থেকে। তাঁরা আল্লাহর মারিফাতের দর্স পেয়েছিলেন তাঁরই কাছে সরাসরি। তাঁরা ছিলেন আল্লাহ ও তাঁর রসূলের জন্য নিবেদিত প্রাণ। শোকে-দুঃখে তাঁরা ছিলেন তাঁর অনুগত সাথী। তাঁর প্রতি ছিল তাঁদের অগাধ বিশ্বাস, অন্তহীন ভক্তি। তাঁর দুঃখে তাঁরা কাঁদতেন। ইসলামের সামান্যতম ক্ষতিও তাঁদের হৃদয়ে ব্যথার সৃষ্টি করত।

তাঁরা তাঁর উপদেশে মুগ্ধ হতেন। জান্নাত ও জাহান্নামের কথা শুনে কাঁদতেন। আনাস رضي الله عنه বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা আমাদেরকে এমন ভাষণ শুনালেন যে, ওর মত (ভাষণ) কখনোও শুনিনি। তিনি বললেন, “যা আমি জানি তা যদি তোমরা জানতে, তাহলে তোমরা কম হাসতে

এবং অধিক কাঁদতে।” (এ কথা শুনে) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণ তাঁদের চেহারা ঢেকে নিলেন এবং তাদের বিলাপের রোল আসতে লাগল। *(বুখারী ও মুসলিম)*

সর্বশ্রেষ্ঠ সাহাবী প্রথম খলীফা রসূল ﷺ-এর শ্বশুর আবূ বাক্র সিদ্দীক ﷺ কাঁদতেন। জীবন-সায়াহ্নে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কষ্ট বেড়ে গেল, তখন তাঁকে (জামাআত সহকারে) নামায পড়ার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হল। তিনি বললেন, “তোমরা আবূ বাক্রকে নামায পড়াতে বল।” কিন্তু তাঁর কন্যা আয়েশা সিদ্দীকাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, ‘আবূ বাক্র নরম মনের মানুষ, কুরআন পড়লেই তিনি কান্না সামালতে পারেন না।’ কিন্তু পুনরায় তিনি বললেন, “তাঁকে নামায পড়াতে বল।”

অন্য এক বর্ণনায় আছে, আয়েশা বললেন, ‘আবূ বাক্র যখন আপনার জায়গায় দাঁড়াবেন, তখন তিনি কান্নার কারণে লোকেদেরকে (কুরআন) শুনাতে পারবেন না।’ *(বুখারী ও মুসলিম)*

তিনি বলতেন, ‘তোমরা কাঁদতে না পারলে, কাঁদার ভান কর।’ *(ইবনে আবী শাইবাহ ৮/২৯৭)*

দ্বিতীয় খলীফা রসূল ﷺ-এর শ্বশুর উমার বিন খাত্ত্বাব ﷺ বড় জাঁদরেল মানুষ ছিলেন। তাঁকে দেখে শয়তান পর্যন্ত ভয়ে অন্য রাস্তা ধরত। তিনিও কাঁদতেন। আব্দুল্লাহ বিন শাদ্দাদ বলেন, ‘একদা সর্বশেষ কাতারে থেকেও আমি উমারের কান্নার শব্দ শুনছিলাম। তখন তিনি পড়ছিলেন,

[إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللهِ] (٨٦) سورة يوسف

অর্থাৎ, ‘আমি আমার অসহনীয় বেদনা ও দুঃখ শুধু আল্লাহরই নিকট নিবেদন করছি। *(ইউসুফঃ ৮৬, ইবনে আবী শাইবাহ ৮/২৯৭)*

আবূ আসীদের স্বাধীনকৃত দাস আবূ সাঈদ বলেন, ‘উমার নামায শেষে লোকেদেরকে মসজিদ থেকে বের ক’রে দিতেন। একদা তিনি আমাদের নিকট এলেন। অতঃপর যখন তিনি নিজ সঙ্গীদেরকে দেখলেন, তখন দুর্রা (চাবুক) ফেলে দিয়ে বসে গেলেন। তিনি বললেন, ‘তোমরা (আমার জন্য) দুআ কর।’ সঙ্গীরা দুআ করলেন। প্রত্যেকেই দুআ করলেন।

অবশেষে আমার দুআর পালি এল। আমি দাস হয়েও দুআ করলাম। আমি তাঁকে দেখলাম, তিনি দুআ করছেন ও এমন কাঁদছেন যে, সে কাঁদা সন্তানহারা মায়েও কাঁদে না। তা দেখে আমি মনে মনে বললাম, ‘এঁরই জন্য তোমরা বল, তিনি বড় কঠোর-হৃদয়!’ *(ইবনে আবী শাইবাহ ৮/২৯৬)*

আনাস ﷺ বলেন, এক সময় আমি নবী ﷺ-এর নিকট এলাম। তখন তিনি ছোবড়ার দড়ি দিয়ে বোনা খাটের ওপর শুয়ে ছিলেন। তাঁর মাথার নিচে খেজুর ছোবড়ার তৈরি একটি বালিশ ছিল। তাঁর দেহ ও খাটের মাঝে একটি মাত্র কাপড় ছিল। (তাতে তাঁর দেহে দাগ পড়ে গিয়েছিল।) ইতিমধ্যে উমার ﷺ তাঁর কাছে এলেন। তাঁর এই অবস্থা দেখে তিনি কেঁদে ফেললেন। নবী ﷺ তাঁকে বললেন, “কীসের জন্য কাঁদছ উমার?” উমার ﷺ বললেন, ‘আল্লাহর কসম! আমি এ জন্য কাঁদছি যে, আমি জানি আপনি আল্লাহর নিকট কিসরা ও কায়সার অপেক্ষা অধিক মর্যাদাবান। কিন্তু তারা দুনিয়ায় কত সুন্দর জীবন-যাপন করছে। আর আপনি আল্লাহর রসূল হওয়া সত্ত্বেও এই অবস্থায় জীবন-যাপন করছেন!’ নবী ﷺ তাঁকে বললেন, “উমার! তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তাদের জন্য দুনিয়া হোক, আর আমাদের জন্য আখেরাত?” উমার বললেন, ‘অবশ্যই হে আল্লাহর রসূল!’ তিনি বললেন, “তাহলে তেমনটাই হবে।” *(বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ)*

তৃতীয় খলীফা রসূল ﷺ-এর দুই কন্যা বিবাহের সৌভাগ্য লাভকারী জামাতা উযমান বিন আফ্ফান ﷺ কাঁদতেন। তিনি যখন কোন কবরের পাশে দাঁড়াতেন, তখন এত কাঁদা কাঁদতেন যে, চোখের পানিতে তাঁর দাড়ি ভিজে যেত। কেউ তাঁকে বলল, ‘জান্নাত ও জাহান্নামের আলোচনাকালে আপনি তো কাঁদেন না, আর এই কবর দেখে এত কাঁদছেন?’ উত্তরে তিনি বললেন, ‘যেহেতু আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “পরকালের (পথের) মঞ্জিলসমূহের প্রথম মঞ্জিল হল কবর। সুতরাং যে ব্যক্তি এ মঞ্জিলে নিরাপত্তা লাভ করে তার জন্য পরবর্তী মঞ্জিলসমূহ

অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে যায়। আর যদি সে এখানে নিরাপত্তা লাভ না করতে পারে, তবে তার পরবর্তী মঞ্জিলগুলো আরো কঠিনতর হয়।” আর তিনি এ কথাও বলেছেন যে, “আমি যত দৃশ্যই দেখেছি, সে সবের চেয়ে অধিক বিভীষিকাময় হল কবর!” *(সহীহ তিরমিযী ১৮৭৮, ইবনে মাজাহ ৪২৬৭নং)*

একদা আব্দুর রহমান বিন আওফ ﷺ-এর নিকট তাঁর খাবার আনা হল। তিনি বললেন, ‘মুসআব বিন উমাইর নিহত হলেন। তিনি আমার চেয়ে ভাল লোক ছিলেন। তাঁকে কাফনানোর সময় একটি চাদর ছাড়া অন্য কিছু জুটল না। হামযা (অথবা অন্য একজন) নিহত হলেন। তিনি আমার চেয়ে ভাল লোক ছিলেন। তাঁকে কাফনানোর সময় একটি চাদর ছাড়া অন্য কিছু জুটল না। এখন আমার ভয় হয় যে, হয়তো আমাদের পুণ্যরাশি পার্থিব জীবনেই ভোগ করতে দেওয়া হয়েছে।’ অতঃপর তিনি কাঁদতে লাগলেন। *(বুখারী)*

আনাস ﷺ বলেন, রসূল ﷺ-এর জীবনাবসানের পর আবূ বাক্র সিদ্দীক ﷺ উমার ﷺ-কে বললেন, ‘চলুন, আমরা উম্মে আইমানের সাথে সাক্ষাৎ করতে যাই, যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে যেতেন।’ সুতরাং যখন তাঁরা উম্মে আইমানের কাছে পৌঁছলেন, তখন তিনি কেঁদে ফেললেন। অতঃপর তাঁরা তাঁকে বললেন, ‘তুমি কাঁদছ কেন? তুমি কি জানো না যে, আল্লাহর কাছে যা রয়েছে, তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর (দুনিয়া থেকে) অধিক উত্তম?’ তিনি উত্তর দিলেন, ‘আমি এ জন্য কান্না করছি না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য আল্লাহর নিকট যা রয়েছে, তা অধিকতর উত্তম---সে কথা আমি জানি না। কিন্তু আমি এ জন্য কাঁদছি যে, আসমান হতে ওহী আসা বন্ধ হয়ে গেল।’ উম্মে আইমান (তাঁর এ দুঃখজনক কথা দ্বারা) ঐ দু’জনকে কাঁদতে বাধ্য করলেন। ফলে তাঁরাও তাঁর সাথে কাঁদতে লাগলেন। *(মুসলিম)*

সালমান ফারেসী ﷺ বলেছেন, ‘তিনটি জিনিস স্মরণ ক’রে আমার কান্না আসে, আমার প্রিয়জন মুহাম্মাদ ও তাঁর সাহাবাবর্গের বিরহ ব্যথা,

মরণ-যন্ত্রণার বিভিষিকাময় দৃশ্য এবং বিশ্বজাহানের প্রতিপালকের সম্মুখে দণ্ডায়মান অবস্থ। জানি না যে, আমার গমন জাহান্নামে হবে, নাকি জান্নাতে!’ *(হিল্য়াতুল আউলিয়া ১/২০৭, স্বিফাতুস স্বাফ্ওয়াহ ১/৫৪৮)*

একদা হাসান বাসরী (রঃ)এর নিকট ইফতারীর জন্য পানি আনা হল। তিনি তা মুখের নিকট নিয়ে কাঁদতে লাগলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, ‘জাহান্নামবাসীদের পানির আকাঙ্ক্ষা ও তা পূরণ না হওয়ার কথা স্মরণ ক’রে কান্না করছি! (মহান আল্লাহ বলেছেন,)

[وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ الْمَاء أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ] (٥٠) سورة الأعراف

অর্থাৎ, জাহান্নামীরা জান্নাতীদেরকে আহবান ক’রে বলবে, ‘আমাদের উপর কিছু পানি ঢেলে দাও অথবা আল্লাহ জীবিকারূপে তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তা হতে কিছু দাও।’ তারা বলবে, ‘আল্লাহ এ দু’টিকে অবিশ্বাসীদের জন্য নিষিদ্ধ করেছেন।’ *(আ’রাফ ঃ ৫০, হিল্য়াতুল আউলিয়া ৬/ ১৮৯)*

ইব্রাহীম নাখায়ী অসুস্থ অবস্থায় কাঁদতে লাগলেন। কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, ‘আমি কেন কাঁদব না? আমি যে আমার প্রতিপালকের দূতের অপেক্ষায় আছি, যিনি আমাকে সুসংবাদ দেবেন অথবা দুঃসংবাদ।’ *(ইবনে আবী শাইবাহ ৮/২৭৮, হিল্য়াতুল আউলিয়া ৪/২২৪)*

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ﷺ বড্ড নরম মানুষ ছিলেন। তিনি আল্লাহর ভয়ে এত কাঁদতেন যে, বলা হয়, তাঁর ফলে তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। চোখের পানি বয়ে বয়ে তাঁর গালের উপর দাগ পড়ে গিয়েছিল। *(ইবনে আবী শাইবাহ)*

অনুরূপ আব্দুল্লাহ বিন উমার ﷺ-এর অধিকাধিক কান্নার ফলে তাঁর গালে দু’টি কালো দাগ ছিল। *(হিল্য়াতুল আউলিয়া ১/৫১)* তাঁর পিতা উমার ﷺ-এর গালেও একই দাগ ছিল। *(শুআবুল ঈমান, বাইহাক্বী ১/৪৯৩, স্বিফাতুস স্বাফ্ওয়াহ ১/২৮৬)*

ঐ একই দাগ ছিল নবী য়্যাহ্য়্যা বিন যাকারিয়ার গালে। *(হিল্য়াতুল*

আউলিয়া ৮/১৪৯)

আব্দুল্লাহ বিন আম্র বিন আস ﷺ বলতেন, 'এক হাজার দীনার দান করা অপেক্ষা আল্লাহর ভয়ে অশ্রু-বিসর্জন করা আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়।' *(শুআবুল ঈমান, বাইহাক্বী ১/৫০২, স্বিফাতুস স্বাফ্ওয়াহ ১/৬৫৮)*

কা'ব আল-আহবার ﷺ বলেছেন, 'আমার দেহের ওজন পরিমাণ স্বর্ণ দান করা অপেক্ষা আল্লাহর ভয়ে কান্নায় দুই গালে অশ্রু বয়ে যাওয়া আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়। সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে কা'বের প্রাণ আছে! কোন মুসলিম আল্লাহর ভয়ে কান্না ক'রে এক বিন্দু অশ্রু মাটিতে ফেললে তাকে জাহান্নাম স্পর্শ করবে না; যতক্ষণ না মেঘ থেকে ঝরে পড়া বৃষ্টি মেঘে ফিরে যায়। আর তা কোনদিন ফিরবার নয়।' *(ইবনে আবী শাইবাহ ৭/২২৬, হিল্য়াতুল আউলিয়া ৫/৩৬৬)*

আবূ হুরাইরা ﷺ তাঁর (শেষ) রোগে কাঁদতে লাগলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'কীসের জন্য কাঁদছেন আপনি?' তিনি বললেন, 'শোনো! আমি তোমাদের এই দুনিয়ার জন্য কাঁদিনি। আমি কাঁদছি আমার সফরের দূরত্ব ও সম্বলের স্বল্পতার জন্য! আমি এখন জান্নাত অথবা জাহান্নামের দিকে চড়তে লেগেছি। আর জানি না যে, দু'টির মধ্যে কোন্‌টির দিকে আমাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হবে!' *(হিল্য়াতুল আওলিয়া)*

ফুয়ালাহ বিন স্বাইফী খুব কাঁদাকাটি করতেন। এক ব্যক্তি তাঁকে দেখা করতে গিয়ে দেখল, তিনি কাঁদছেন। সে এ ব্যাপারে তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলে বললেন, 'উনি মনে করেন, উনাকে বড় দূর সফরে যেতে হবে। আর উনার সঙ্গে কোন পাথেয় নেই।' *(আল-মুদহিশ, ইবনুল জাওযী ১/২০৪)*

আত্বা সুলাইমীকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত (হয়ে কাঁদতে) দেখে জিজ্ঞাসা করা হল, 'কেন এ দুশ্চিন্তা (কেন এ কান্না)?' উত্তরে তিনি বললেন, 'হায় হায়! মরণ আমার ঘাড়ে, কবর আমার ঘর, কিয়ামত আমার দাঁড়াবার জায়গা, জাহান্নামের পুল (সিরাত) আমার পথ। আর জানি না যে, আমার সাথে কী আচরণ করা হবে!' *(স্বিফাতুস স্বাফ্ওয়াহ ৩/৩২৭)*

হাসান বাসরী এক রাত্রে কেঁদে উঠলেন। তা দেখে বাড়ির লোকেও

কাঁদতে শুরু করল। কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, 'একটি গোনাহর কথা মনে পড়ে গেল, তাই কান্না এসে গেল!' *(তাবস্বিরাহ, ইবনুল জাওযী ১/২৮০)*

মদীনার গভর্নর উমার বিন আব্দুল আযীযের নিকট এক ব্যক্তি কুরআন পড়ে শুনাল,

[وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا] ﴿الفرقان : ١٣﴾

অর্থাৎ, যখন হস্তপদ শৃঙ্খলিত অবস্থায় ওদেরকে তার কোন সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে, তখন ওরা সেখানে ধ্বংস কামনা করবে। *(ফুরক্বানঃ ১৩)*

তা শুনে তিনি উচ্চ স্বরে কেঁদে ফেললেন। তাঁর কান্নার শব্দ উঁচু হয়ে গেলে তিনি মজলিস ছেড়ে উঠে গিয়ে নিজ বাসায় প্রবেশ করলেন এবং লোকেরাও প্রস্থান করল। *(আদ্-দাওলাতুল উমাবিয়্যাহ ৩/১২৫)*

সাবেত (রঃ) খুব কান্নাকাটি করতেন। এমনকি বেশি কান্নার জন্য তাঁর চক্ষু নষ্ট হওয়ার উপক্রম হল। বাড়ির লোক ডাক্তার ডেকে এনে চিকিৎসা করাতে চাইল। ডাক্তার বললেন, 'আমি আপনার চোখের চিকিৎসা করব, তবে আমার কথা মেনে চলতে হবে।' তিনি বললেন, 'তা কী?' ডাক্তার বললেন, 'আপনি আর কাঁদতে পারবেন না।' তিনি বললেন, 'যদি চোখ কাঁদতেই না পারে, তাহলে তার কল্যাণই আর কী?' অতঃপর চিকিৎসা করতে অস্বীকার করলেন! *(হিল্য়াতুল আওলিয়া ২/৩২৩)*

[أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لاَ نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُم] ﴿سورة الزخرف : ٨٠﴾

অর্থাৎ, ওরা কি মনে করে যে, আমি ওদের গোপন বিষয় ও গোপন পরামর্শের খবর রাখি না? *(যুখরুফঃ ৮০)*

কুরআনের এই আয়াত পড়ে একদা সুফিয়ান সওরী 'অবশ্যই হে প্রতিপালক! অবশ্যই হে প্রতিপালক!' বলতে বলতে দীর্ঘ সময় গৃহের ছাদের দিকে তাকিয়ে কেঁদে কেঁদে অশ্রু বিসর্জন করেছেন। *(আর্রিক্কাতু অল-বুকা ১/৫৬)*

কোন কোন সলফে সালেহীন দিবারাত্রি কান্না করতেন। কারণ জিজ্ঞাসা

করা হলে তিনি বলতেন, 'আল্লাহ আমাকে পাপ করতে দেখেছেন। আমার ভয় হয়, তিনি হয়তো বলবেন, "দূর হয়ে যা আমার কাছ থেকে। আমি তোর প্রতি রাগান্বিত।" *(আয়-যাহরুল ফা-য়িহ, ইবনুল জাযরী ১/৩০)*

এই জন্যই সুফিয়ান সওরী কাঁদতেন এবং বলতেন, 'আমার ভয় হয় যে, হয়তো মরণের সময় ঈমান ছিনিয়ে নেওয়া হবে।' *(হিল্য়াতুল আওলিয়া ৭/১২)*

ইসমাঈল বিন যাকারিয়া বলেন, হাবীব বিন মুহাম্মাদ আমার প্রতিবেশী ছিলেন। সকাল-সন্ধ্যায় আমি তাঁর কান্না শুনতে পেতাম। একদিন তাঁর স্ত্রীকে কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, 'আল্লাহর কসম! উনার ভয় হয়, সন্ধ্যা হলে হয়তো উনি সকাল পাবেন না, আর সকাল পেলে হয়তো আর সন্ধ্যা পাবেন না!' *(তাবস্বিরাহ, ইবনুল জাওযী ২/৫৩)*

ইয়াযীদ রাক্কাশী খুব কাঁদতেন। এ ব্যাপারে কেউ আপত্তি ক'রে তাকে বলল, 'জাহান্নাম যদি আপনার জন্য সৃষ্টি হত, তাহলে হয়তো এর চেয়ে বেশি কাঁদতেন না!' তিনি বললেন, 'জাহান্নাম আমার জন্য, আমার সাথীদের জন্য এবং মানব-দানব ভাইদের জন্য ছাড়া কি অন্য কারো জন্য সৃষ্টি হয়েছে?' *(আত্-তাখবীফু মিনান্নার ১/৩৪)*

উমার বিন যার বলেন, 'আমি যখনই কোন রোদনকারীকে দেখি, তখনই আমার মনে হয় যে, তার উপর রহমত বর্ষণ হচ্ছে।' *(আর্রিক্কাতু অল-বুকা ১/৫)*

সুফিয়ান বিন উয়াইনাহ বলেন, 'কান্না হল তাওবার একটা চাবি। দেখ না, কান্নাকারী নম্র ও অনুতপ্ত হয়?' *(ঐ ১/৬)*

আবু বাক্র সিদ্দীকের যুগে ইয়ামান থেকে কিছু লোক এসে কুরআন শ্রবণ ক'রে কাঁদতে লাগল। তিনি বললেন, 'আমরা এই রকমই ছিলাম, তারপর হৃদয় কঠিন হয়ে গেছে।' *(ইবনে আবী শাইবাহ ৮/২৯৬)*

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদের ছাত্র হারেষ বিন সুওয়াইদ একদা সূরা যিলযাল পড়ে শেষ ক'রে কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন,

[فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ] (٨)

অর্থাৎ, সুতরাং কেউ অণু পরিমাণ ভালো কাজ করলে, সে তা দেখতে পাবে এবং কেউ অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করলে, তাও সে দেখতে পাবে। *(যিলযাল ঃ ৭-৮)*

এ পরিসংখ্যা তো বড় কঠিন!' *(ইবনে আবী শাইবাহ ৮/২৯৯)*

মানসূর বিন মু'তামির আল্লাহকে খুব ভয় করতেন এবং তাঁর ভয়ে খুব বেশি কান্নাকাটি করতেন। যায়েদাহ বিন কুদামাহ বলেন, 'তাঁকে দেখলে আমি বলতাম, তিনি হয়তো কোন মুসীবতে পড়েছেন।' একদা তাঁর মা তাঁকে বললেন, 'নিজের শরীর নিয়ে এ কী করছ তুমি? প্রায় সারা সারা রাত তুমি কাঁদছ! খুব কম সময়ই ক্ষান্ত থাকছ। বেটা! তুমি কি কোন মানুষ খুন করেছ?' তিনি বললেন, 'মা গো! আমি কী করেছি, তা আমি ভাল জানি।' *(শুআবুল ঈমান, বাইহাক্বী ১/১০৫)*

হাসান বিন আরাফাহ বলেন, 'ইয়াযীদ বিন হারূনকে ওয়াসেত শহরে দেখেছি, তাঁর চোখ দু'টি বড় সুন্দর ছিল। কিছুদিন পর তাঁর একটা চোখ নষ্ট দেখলাম। আরো কিছুদিন পর দেখলাম, তাঁর অপর চোখটিও নষ্ট হয়ে গেছে। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, "হে আবু খালেদ! আপনার সুন্দর চোখ-দু'টি কী হল?" উত্তরে তিনি বললেন, 'ভোরের কান্না নষ্ট ক'রে দিয়েছে।' *(তাহযীবুত তাহযীব ৩/৪৫৬)*

এই হল সলফদের অবস্থা। যিনি যত বড়ই হন, আল্লাহর কাছে তো সবাই ছোট। সুতরাং ভাইজান! আরবী কবির কথা মেনে নিন,

امنع جفونك أن تذوق مناما ... وذَرِ الدموع على الخدود سجاما

واعلم بأنك ميت ومحاسب ... يا من على سخط الجليل أقاما

لله قومٌ أخلصوا في حبه ... فرضي بهم واختصهم خداما

قومٌ إذا جن الظلام عليهم ... باتوا هنالك سجداً و قياما

অর্থাৎ, তোমার চোখের পলককে বাধা দাও, যেন নিদ্রার স্বাদ গ্রহণ না করতে পারে। অশ্রুকে নিজ গালে প্রবাহিত হতে দাও।

জেনে রাখো হে সেই ব্যক্তি, যে মহান আল্লাহর অসন্তুষ্টির পথে রয়েছ! তোমাকে মরতে হবে এবং হিসাব দিতে হবে।

এমন সম্প্রদায় আছে, যারা আল্লাহর ভালবাসায় আন্তরিক। তাই আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তিনি তাদেরকে খাসভাবে (দ্বীনের) খাদেম বানিয়েছেন।

সে সম্প্রদায় রাতের অন্ধকার ছেয়ে এলে সিজদা ও কিয়ামে রাত্রি অতিবাহিত করে।

وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

সমাপ্ত